বাংলাদেশে দারিদ্র ও অসমতা:
উত্তরণের পথে যাত্রা
(২০১৪-২০১৫)

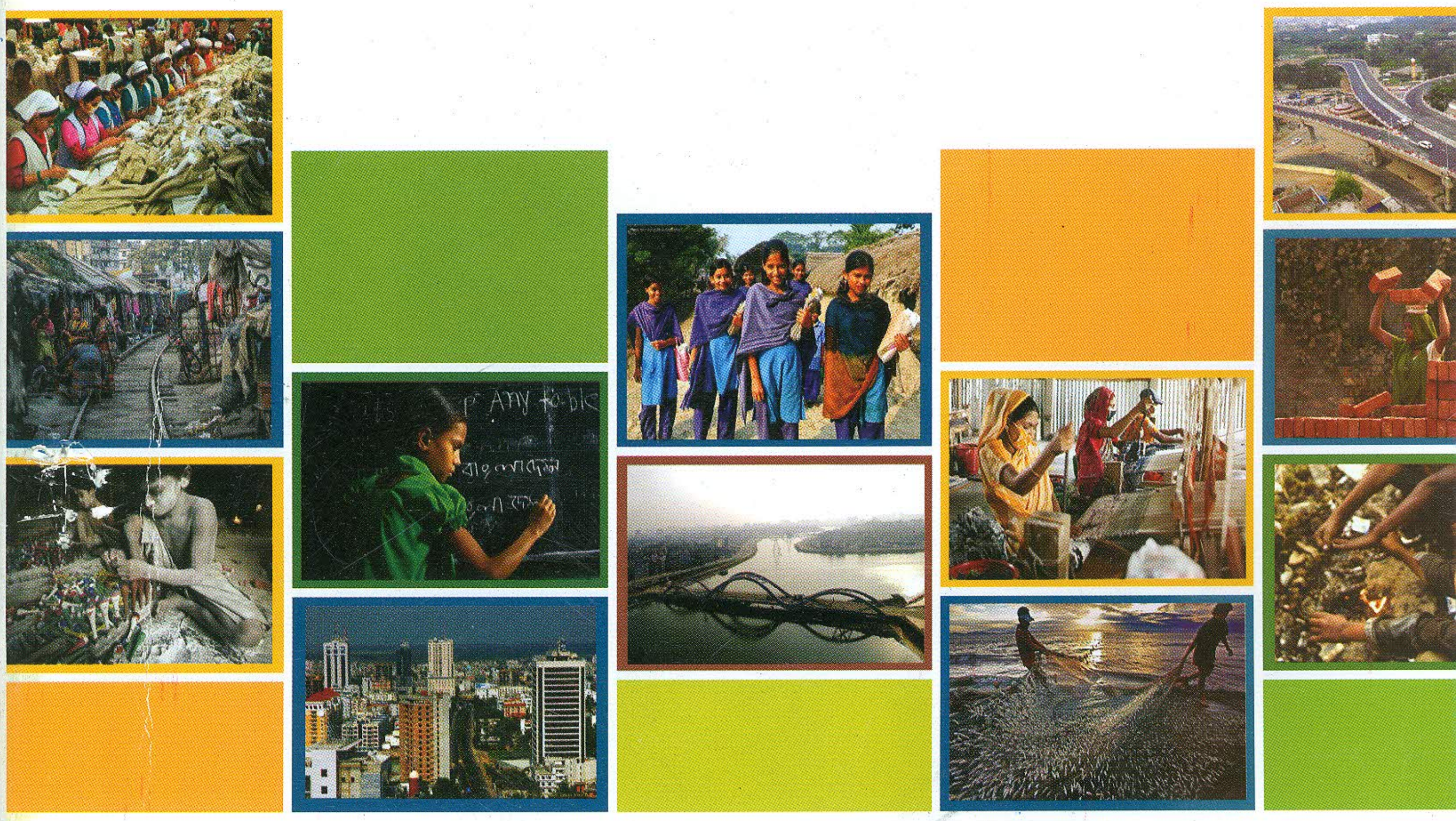

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Website : www.mof.gov.bd | E-mail : info@mof.gov.bd

মুখবন্ধ

'বাংলাদেশে দারিদ্র ও অসমতা ঃ উত্তরণের পথে যাত্রা' (২০১৪-১৫) পুস্তিকাটি দ্বিতীয়বারের মত জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে পেশ করা হলো। এতে দারিদ্র পরিস্থিতি, প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র বৈষম্য এবং সম্পদ বন্টনের অসমতার (Inequality) চিত্র দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরো বিশদভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকার দারিদ্র নিরসন ও সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণকে তার উন্নয়ন কৌশলের পুরোভাগে স্থান দিয়েছে। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় দারিদ্র ও মানব দারিদ্র (Human Poverty) সর্বনিম্নপর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে যা দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বাস্তবায়ন চলছে। এছাড়া সরকারের ঘোষিত প্রতিটি বাজেট প্রণীত হয়েছে সেই লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে।

অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive Growth) অর্জনের নীতি কৌশলের আওতায় বাংলাদেশে দারিদ্র কমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে। সচরাচর কোন উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনী-গরীবের মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে। জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া এ অংশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা বিকাশমান অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সফল হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি দারিদ্রের হার সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্র ও পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছে। আঞ্চলিক সমতা বিধানের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ (Household Income and Expenditure Survey, 2010) এ দেখা গেছে যে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভূক্ত হয়েছে।

নব্বই'র দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে বার্ষিক গড়ে প্রায় ২.১ শতাংশ হারে দারিদ্র (Incidence of poverty) হ্রাস পেয়েছে। খানা আয়/আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ি ১৯৯১-৯২ সালে দারিদ্রের হার ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে ৪৮.৯ শতাংশ এবং ২০১০ সালে তা ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ নব্বই'র দশকে গড়ে দারিদ্র কমেছে ১.৮ শতাংশ হারে এবং গত দশকে কমেছে ৪.৩ শতাংশ হারে। লক্ষ্যণীয় যে, এ দুই দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল যথাক্রমে ৪.৯ শতাংশ ও ৫.৮ শতাংশ। দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap) যা দারিদ্র রেখা থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় আয়ের ব্যবধান এবং দারিদ্র বর্গ ব্যবধান (Squared Poverty Gap) যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে আয়ের ব্যবধান নির্দেশ করে, এ উভয় সূচকেরই তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৯১-৯২ এ দারিদ্র ব্যবধান ১৭.২ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে ১২.৮ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ৬.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, এসময়ে দারিদ্র বর্গ ব্যবধান যথাক্রমে ৬.৮ শতাংশ থেকে ৪.৬ শতাংশে এবং ২.০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ভোগ গিনি সহগ (Gini Coefficient) ২০০০ সালের ০.৩৩ থেকে ২০১০ সালে ০.৩২ শতাংশে নেমে এসেছে যা সমাজের বৈষম্য হ্রাসের ইংগিত বহন করে। গত দশকের উপাত্ত পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে দারিদ্র হ্রাসের গড় হার ছিল ৩.৯ শতাংশ, ২০০৫ হতে ২০১০ সালে এ হার ছিল ৪.৭ শতাংশ। একই সময়ের ব্যবধানে

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় ছিল যথাক্রমে ৫.৪ শতাংশ ও ৬.২ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাসে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

পুস্তিকাটিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দারিদ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান, দারিদ্র ও অসমতা নিরসনে সরকারের নীতি কৌশল বিবৃত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দারিদ্র নিরসনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পুস্তিকাটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। পুস্তিকাটি গবেষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে সমভাবে সমাদৃত হবে বলে আমি আশা রাখছি।

পুস্তিকাটি প্রণয়নে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সহ যে সকল সংস্থার উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে তথ্যবহুল এ পুস্তিকাটি প্রণয়নে অর্থ বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

মন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	ভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিত	১
২.০	বাংলাদেশের দারিদ্র পরিমাপ	৩
৩.০	বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা	৬
৪.০	বাংলাদেশের আঞ্চলিক দারিদ্র	১১
৫.০	আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দারিদ্র ও অসমতা	১৫
৬.০	বাংলাদেশের অসমতার পরিবর্তন	১৮
৭.০	বাংলাদেশের দারিদ্র ও অসমতার বৈশিষ্ট্য	২৪
৮.০	দারিদ্র নিরসনে সরকারের ভূমিকা, বাজেট ব্যয় ও কার্যক্রমসমূহ	২৮
৯.০	বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের চালিকা শক্তি	৩২
১০.০	ভবিষ্যৎ গতিধারা	৪৫
১১.০	ভবিষ্যৎ করণীয়	৪৭

সারণির তালিকা

সারণি নম্বর	সারণি শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সারণি ১	হেডকাউন্ট দারিদ্র (সিবিএন পদ্ধতি)	৭
সারণি ২	হেডকাউন্ট সূচকের বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	৮
সারণি ৩	দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতা (উচ্চ দারিদ্র রেখায় পরিমাপকৃত)	১০
সারণি ৪	সিবিএন পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত বিভাগ ভিত্তিক দারিদ্রের আপতন (হেডকাউন্ট রেট)	১১
সারণি ৫	২০০৫-১০ সময়ে অঞ্চলভিত্তিক হেডকাউন্ট বার্ষিক দারিদ্র পরিবর্তনের শতকরা হার	১৩
সারণি ৬	দারিদ্রের আঞ্চলিক গভীরতা এবং তীব্রতা	১৪
সারণি ৭	বিভাগওয়ারী দারিদ্র সীমার গড় ভোগ ও গড় ঘাটতি	১৪
সারণি ৮	বিভিন্ন দেশের তুলনায় হেডকাউন্ট রেটে বাংলাদেশের অবস্থান	১৫
সারণি ৯	বিশ্ব অসমতা পরিস্থিতি (২০০৩-১৩)	১৭
সারণি ১০	দশমাংশ ভিত্তিক আয় বন্টন এবং গিনিসূচক	১৮
সারণি ১১	দশমাংশ ভিত্তিক ভোগ বন্টন এবং গিনিসূচক	১৯
সারণি ১২	সরকারের দারিদ্র বিমোচন ব্যয়	২৮

সারণি ১৩	সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত	২৯
সারণি ১৪	মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিজনিত দারিদ্র স্থিতিস্থাপকতা	৩৩
সারণি ১৫	স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের নির্বাচিত সূচকসমূহের পরিবর্তন	৪০
সারণি ১৬	দারিদ্র হার হ্রাসের প্রক্ষেপণ	৪৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র নম্বর	নাম	পৃষ্ঠা
চিত্র ১	দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা	৭
চিত্র ২	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় ভোগ ব্যয় (উচ্চ দারিদ্রসীমা আয়ের শতকরা হার)	৮
চিত্র ৩	দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতা	১০
চিত্র ৪	বিভাগ ভিত্তিক দারিদ্রের আপতন	১২
চিত্র ৫	দারিদ্রের অঞ্চলভিত্তিক গভীরতা এবং তীব্রতা	১৪
চিত্র ৬	দশমাংশভিত্তিক ভোগ বন্টন (২০০৫-২০১০)	২০
চিত্র ৭	ভোগ লরেঞ্জ রেখা (১৯৯৬-২০১০)	২১
চিত্র ৮	লরেঞ্জ রেখা,পল্লী ও শহর (২০০০-২০১০)	২১
চিত্র ৯	আয় ও ভোগ লরেঞ্জ রেখা (২০০৫-২০১০)	২২
চিত্র ১০	মাথাপিছু আয় এবং ভোগ গিনি সূচক	২৩
চিত্র ১১	দরিদ্র লোকের সংখ্যা	২৪
চিত্র ১২	ভোগ ব্যয় পরিবর্তন সাপেক্ষে দারিদ্র সূচকসমূহের স্থিতিস্থাপকতা	৩৩
চিত্র ১৩	প্রবৃদ্ধির আপতন রেখা	৩৪
চিত্র ১৪	দারিদ্র পরিবর্তনে প্রবৃদ্ধি ও পুনর্বন্টনের অবদান	৩৫
চিত্র ১৫	পরিবার প্রতি আয় ও ভোগ ব্যয় এবং বেসরকারি স্থানান্তর	৩৭
চিত্র ১৬	সরকারি ব্যয় (জিডিপির অংশ) ও মাথাপিছু আয় প্রবৃদ্ধি (১৯৭৬-২০১০)	৩৯
চিত্র ১৭	মাথাপিছু মূলধন গঠন প্রক্রিয়া এবং প্রকৃত মজুরী	৪১
চিত্র ১৮	উৎপাদন ও আয় কাঠামোর পরিবর্তন	৪৩
চিত্র ১৯	কৃষি জমি এবং কৃষির উৎপাদন	৪৩
চিত্র ২০	ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন	৪৪
চিত্র ২১	দারিদ্র হার হ্রাসের প্রক্ষেপণ	৪৬

বক্সের তালিকা

বক্স নম্বর	নাম	পৃষ্ঠা
বক্স ১	দারিদ্রের সংজ্ঞা ও পরিমাপ	৪
বক্স ২	গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র সূচকসমূহ	৫

সংযোজনীর তালিকা

সংযোজনী	নাম	পৃষ্ঠা
সংযোজনী ১	২০০৩-১২ সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় এবং দারিদ্র পরিস্থিতি	৫১-৫৫
সংযোজনী ২	সামাজিক গতিশীলতা ও অসমতাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	৫৬-৬০
	রেফারেন্স	৬০-৬২

১.০ ভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিত

১.১ বর্তমান সরকার দারিদ্রের লজ্জা ঘুচিয়ে একটি ক্ষুধামুক্ত মানবিক সমাজ নির্মাণে বদ্ধ পরিকর।'রূপকল্প ২০২১' এর মূল লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক শোষণ ও দারিদ্রমুক্ত এবং সামাজিক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী বাংলাদেশ গড়া। যেখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর উচ্চতর প্রবৃদ্ধি; যার ফলে আয়-দারিদ্র ও মানব-দারিদ্র নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে। সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্তির এ অভিপ্রায় বিশদভাবে বিধৃত হয়েছে। ইশতেহারে বর্ণিত সরকারের দারিদ্র কৌশলের মূল লক্ষ্যই হলো ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের দারিদ্রের হার ১৫ শতাংশের নিচে (১৩ শতাংশ) নামিয়ে আনা। 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ি ২০২১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগ অর্জনের মধ্য দিয়ে দারিদ্রের হার ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের হার ইতোমধ্যে ১.৭ শতাংশ থেকে ২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থনৈতিক চলকসমূহের পাশাপাশি সামাজিক নির্ণায়কসমূহে অভূতপূর্ব উন্নতি দ্রুত দারিদ্র হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। নোবেল বিজয়ী বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাই তাঁর Uncertain Glory: India and its Contradictions গ্রন্থে বাংলাদেশের আয় বহির্ভূত বিভিন্ন সামাজিক চলকসমূহের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন[১]।

১.২ জাতিসংঘ ঘোষিত Millenium Development Goals (MDGs) এ ১৯৯০ সালে নির্ধারিত ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র হারকে অর্ধেকে কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। সে সময়ে (১৯৯০) বিদ্যমান ৫৬.৬ শতাংশ দারিদ্রের হার ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার শতকরা ২৯ ভাগে নামিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা আশা করা যায় নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জন করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের জন্য প্রক্ষেপিত (Estimated) দারিদ্রের হার জাতীয় পর্যায়ে ২৪.৩ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশে এমডিজি'র এ লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। দারিদ্রের ব্যবধান ২০১৫ সালের মধ্যে শতকরা ৮.০ ভাগে নামিয়ে আনার লক্ষ্যের বিপরীতে ২০১০ সালের মধ্যেই ৬.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতে ধারাবাহিকভাবে সরকারের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টা ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি দারিদ্রের নিম্নমুখী হারকে শুধু ত্বরান্বিতই করেনি সে সাথে দারিদ্রের বিস্তৃতিকেও কমিয়ে সমাজে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কমিয়ে আনতে সহায়তা করেছে।

১.৩ 'রূপকল্প ২০২১' এ দারিদ্র রেখার নিম্নে বসবাসরত বিদ্যমান ৪ কোটি ৬০ লক্ষ জনসংখ্যাকে কমিয়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জনপ্রতি প্রতিদিন ২,১২২ কিলো. ক্যালরি খাদ্য সরবরাহ এবং মোট জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম ৮৫ ভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রমিত পুষ্টিযুক্ত খাদ্য (Standard Nutritious Food) সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

---

[১] "Over the last two decades India has expanded its lead over Bangladesh in terms of average income (it is now twice as rich in income per capita as Bangladesh), and yet in terms of many typical indicators of living standards (other than income per head), Bangldesh not only does better than India, it has a considerable lead over it (just as India had, two decades ago, a substantial lead over Bangladesh in the same indicators)"

১.৪ বাংলাদেশে দারিদ্র ও অসমতা নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নানাবিধ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। তবে, সরকারিভাবে দারিদ্র ও অসমতার স্বরূপ উদঘাটনে তেমন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অর্থ বিভাগ হতে গত অর্থবছরে প্রণীত এই পুস্তিকায় বাংলাদেশের দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত অগ্রগতির বর্ণনার পাশাপাশি যে সব কারণে এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর এ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দারিদ্রের অবস্থান তুলনা করতে বিগত বছরের ব্যবহৃত ১০৯টি দেশের তথ্য উপাত্তের স্থলে ১৪৬টি দেশের তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশের দারিদ্র ও অসমতার বৈশিষ্ট্য শীর্ষক একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। দারিদ্রের সংজ্ঞা ও এর পরিচিতিকে পাঠকদের নিকট সহজভাবে উপস্থাপনে দ্বিতীয় অধ্যায়ে নতুন একটি বক্স সংযোজন করা হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়সমূহ অপরিবর্তিত থাকলেও সকল অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পুস্তিকাটি গত বছরের প্রকাশনার একটি পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও পরিশীলিত সংস্করণ।

১.৫ পুরো পুস্তিকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত "Household Income and Expenditure Survey"র পরিসংখ্যান ও তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্রের বর্ণনায় বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "World Development Indicator, 2013" শীর্ষক তথ্য ভান্ডার হতে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। দারিদ্র বিশ্লেষণে দারিদ্র অর্থনীতির প্রমিত কলাকৌশল ও পারিসাংখ্যিক পরিমাপসমূহ যেমনঃ কেন্দ্রীয় প্রবণতা, বিস্তৃতির পরিমাপসমূহ ছাড়াও আধুনিক অর্থমিতির (Modern Econometric approach) কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে।

২.০ বাংলাদেশের দারিদ্র পরিমাপ

২.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) খানা জরিপের (Household Income and Expenditure Survey) মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান দারিদ্র ও অসমতা পরিমাপ করে থাকে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৩-৭৪ সালে খানা জরিপ হয়। সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় ২০১০ সালে। পরিসংখ্যান ব্যুরো খানা জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে দারিদ্র পরিমাপের বিভিন্ন সূচক প্রস্তুত করে থাকে। বিবিএস ১৯৯৫-৯৬ সাল হতে সিবিএন (Cost of Basic Needs) পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপ করছে। এই পদ্ধতিতে তিনটি ধাপে ২টি দারিদ্ররেখা যথা ১. নিম্ন দারিদ্র রেখা (Lower Poverty Line) এবং ২. উচ্চ দারিদ্র রেখা (Upper Poverty Line) পরিমাপ করা হয়। এই দারিদ্র রেখাগুলো পরিমাপের জন্য প্রথমে ব্যক্তির জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের (১১ আইটেমের খাদ্য যথা চাল, গম, ডাল, দুধ, তেল, মাংস, মিঠা পানির মাছ, আলু, শাক-সবজি, চিনি এবং ফল যেখান হতে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন ২,১২২ কিলো. ক্যালোরি গ্রহণ করতে পারে) ন্যূনতম বাজার মূল্য হিসাব করে খাদ্য দারিদ্র সীমার আয় রেখা (Food Poverty Line) নিরূপন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ উপযোগী দুইটি ভিন্ন মানের আয় রেখা পরিমাপ করা হয়। প্রথমটি হলো নিম্ন খাদ্য বহির্ভূত আয় রেখা (Lower Non-food Allowance) এবং দ্বিতীয়টি হলো উচ্চ খাদ্য বহির্ভূত আয় রেখা (Upper Non-food Allowance)। যে সকল পরিবারের মোট ভোগ ব্যয় (খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যসহ) খাদ্য দারিদ্র সীমার আয়ের সমান সে সব পরিবার খাদ্য বহির্ভূত পণ্য ক্রয়ে যা ব্যয় করে তার মধ্যক মানই হলো নিম্ন খাদ্য বহির্ভূত আয় সীমা রেখা। অপরদিকে যে সকল পরিবারের শুধু খাদ্য বাবদ ব্যয় তাদের খাদ্য দারিদ্র রেখার সমান সে সব পরিবার খাদ্য বহির্ভূত খাতে যে ব্যয় করে তাই হলো উচ্চ খাদ্য বহির্ভূত আয় রেখা। সর্বশেষ ধাপে খাদ্য দারিদ্র সীমার আয়ের সাথে নিম্ন খাদ্য বহির্ভূত আয় (Lower Non-food Allowance) যোগ করে নিম্ন দারিদ্র রেখা এবং খাদ্য দারিদ্র সীমার আয়ের সাথে উচ্চ খাদ্য বহির্ভূত আয় (Upper Non-food Allowance) যোগ করে উচ্চ দারিদ্র রেখা হিসাব (Estimate) করা হয়।

২.২ মূলতঃ যে সকল পরিবারের মোট খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় একত্রে খাদ্য দারিদ্র রেখার সমান বা এর চেয়ে কম সে সব পরিবারের অবস্থান নিম্ন দারিদ্র রেখার সমান বা নিচে বিবেচনা করা হয়। অনুরূপভাবে যে সকল দরিদ্র পরিবারের শুধু খাদ্য বাবদ ব্যয় খাদ্য দারিদ্র রেখার সমান এবং মোট ব্যয় একত্রে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উচ্চ দারিদ্র রেখার সমান বা নিচে সে সব পরিবারের অবস্থান উচ্চ দারিদ্র রেখার সমান বা নিচে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং ভোগের ক্ষেত্রে যে সব পরিবারের অবস্থান উচ্চ দারিদ্র রেখার নিচে তারা সবাই দরিদ্র এবং এদের মধ্যে যে সব পরিবারের অবস্থান নিম্ন দারিদ্র রেখার মধ্যে বা এর চেয়ে নিচে তারা অতি দরিদ্র (Ultra Poor) হিসেবে বিবেচিত।

২.৩ বিবিএস দারিদ্রের সংখ্যাগত দিক পরিমাপের সাথে সাথে দারিদ্রের গুণগত দিক ব্যাখ্যার জন্য দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap) এবং দারিদ্রের বর্গ ব্যবধান (Squared Poverty Gap) সংক্রান্ত সূচক প্রস্তুত করে থাকে। মূলতঃ হেডকাউন্ট সূচকের সাহায্যে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কি পরিমাণ পরিবার দরিদ্র তা জানা যায় কিন্তু তাদের এই দারিদ্র কতটা গভীর এবং তীব্র তা জানা যায় না। দারিদ্র ব্যবধান সূচকের সাহায্যে দারিদ্রের গভীরতা এবং দারিদ্রের বর্গ ব্যবধান সূচকের সাহায্যে দারিদ্রের তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বক্স ১: দারিদ্রের সংজ্ঞা ও পরিমাপ

দারিদ্রের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে দারিদ্র বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝানো হয় যেখানে ব্যক্তি বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ন্যূনতম জীবনমান ধারণ উপযোগী সম্পদের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। বস্তুত দারিদ্র একটি বহুমাত্রিক বিষয় যার কোন সরল সংজ্ঞা নেই। বিশ্বব্যাংকের (২০০০) মতে "Poverty is pronounced deprivation in well-being" অর্থাৎ ব্যক্তির কল্যাণ বঞ্চনাই হলো দারিদ্র। কিন্তু ব্যক্তির কল্যাণ কিভাবে আসে তা নিয়েও আছে বিস্তর বিতর্ক। ব্যক্তি কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হলো তার অধিকারভূক্ত পণ্য-সামগ্রির পরিমাণ অর্থাৎ ব্যক্তি বা পরিবারের মালিকানাধীন সম্পদ বৃদ্ধির সাথে কল্যাণ বৃদ্ধির সম্পর্ক ধনাত্মক। এরূপ বিবেচনায় দারিদ্র সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের আয় বা ভোগ ব্যয়ের সাথে ব্যক্তি বা পরিবারের আয় বা ভোগ ব্যয় তুলনা করা হয় এবং যে সব ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়ের তুলনায় কম তাদেরকে দরিদ্র বলে বিবেচনা করা হয়। এরূপ বিশ্লেষণে দারিদ্রকে কেবল একটি আর্থিক বিষয় হিসেবে দেখা হয়।

ব্যক্তিকল্যাণ নির্দেশের আরেকটি পদ্ধতি হলো ব্যক্তি কোন সুনির্দিষ্ট ভোগ্য পণ্য বা সেবা পেতে সক্ষম কিনা। অর্থাৎ ব্যক্তির দখলে পর্যাপ্ত খাদ্য, আবাসস্থল, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে কিনা। অমর্ত্য সেন (১৯৮৭) ব্যক্তি কল্যাণ তথা দারিদ্র বিষয়ে ব্যাপক ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যক্তির সক্ষমতা হতে তার কল্যাণ বা মঙ্গল আসে। সক্ষমতার ঘাটতিই দারিদ্র ডেকে আনে। সক্ষমতার ঘাটতির কারণে হতে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা, আত্ম-বিশ্বাস, মনোবল, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদির অভাব বোধ করে। এই বিবেচনায় দারিদ্রকে একটি বহুমাত্রিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং যার কোন সহজ সমাধান নেই। তাই দারিদ্র কমানোর জন্য সমাজের গড় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে কর্মপন্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং সেই সাথে তাদেরকে ঝুঁকি অথবা কোন বিশেষ দুর্বলতা মোকাবেলায় পারঙ্গম করে তোলা দরকার।

দারিদ্র পরিমাপ

দরিদ্র লোকদের এজেন্ডাভুক্ত রাখা, দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্র পরিবারসমূহকে সনাক্ত করা, দারিদ্র বিমোচন সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা মূল্যায়ন ইত্যাদির প্রয়োজনে দারিদ্র পরিমাপ করতে হয়। দারিদ্র পরিমাপের প্রথম ধাপ হলো কল্যাণ পরিমাপের একটি মানদন্ড সংজ্ঞায়িত করা। মাথাপিছু আয় বা মাথাপিছু ভোগ ব্যয় কল্যাণ পরিমাপের একটি মানদন্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যক্তির কল্যাণ সংক্রান্ত তথ্য জরিপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। উন্নয়নশীল দেশে ব্যক্তির আয়কে তার নির্দিষ্ট সময়ের মোট ভোগ ব্যয় এবং নীট সম্পদের পরিবর্তনের সমান বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির আয় মারাত্মকভাবে অবমূল্যায়িত হয়। অপরদিকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে ব্যক্তির ভোগ ব্যয় তার স্থায়ী আয়ের অনেকটা কাছাকাছি থাকে বিধায় এর তেমন অবমূল্যায়ন হয় না, তবে তা স্থায়ী দ্রব্যাদির অন্তর্নিহিত ব্যয় (Implicit Rental Cost) অন্তর্ভুক্তকরণের দাবী রাখে। পরিবারের সদস্যদের বয়স এবং সদস্য সংখ্যার তারতম্যের কারণে পরিবারভেদে চাহিদারও তারতম্য ঘটে। এ কারণে মাথাপিছু ভোগ বা আয়কে কল্যাণের মানদন্ড হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট স্কেলের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সমতুল্য হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন। কল্যাণ পরিমাপের অন্যান্য জনপ্রিয় মানদন্ডের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি প্রতি দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ; মোট ব্যয়ের মধ্যে খাদ্য বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ; এবং ব্যক্তির পুষ্টি গ্রহণের মাত্রা। তবে সত্যিকার অর্থে ব্যক্তির কল্যাণ পরিমাপের জন্য আদর্শ কোন মানদন্ড নেই, এ কারণে দারিদ্র পরিমাপের জন্য ব্যক্তির কল্যাণের মানদন্ড হিসেবে যে পরিমাপকই ব্যবহার করা হোক না কেন তার সবল এবং দুর্বল দিকসমূহ যাতে দারিদ্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক।

২.৪ বিবিএস চরম দরিদ্র (Absolute Poverty) বিষয়ক সূচকগুলোর পাশাপাশি আপেক্ষিক দারিদ্র (Relative Poverty) অবস্থা অনুধাবনের সুবিধার্থে জনগণের আয় বন্টন কাঠামোর বিস্তারিত চিত্র প্রকাশ করে থাকে এবং সেই সাথে ভোগ গিনি সূচক (Consumption Gini) এবং আয় গিনি সূচকও (Income Gini) পরিমাপ করে। বিবিএস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তথ্য-উপাত্ত পল্লী ও শহর অঞ্চলে বিভাজনপূর্বক জাতীয় এবং প্রশাসনিক বিভাগভিত্তিক বর্ণিত দারিদ্র সূচকসমূহের গতি-প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে আলোচ্য প্রতিবেদনে বাংলাদেশের দারিদ্র ও অসমতার অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বক্স ২ ঃ গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র সূচকসমূহ

একটি দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু ভোগ এবং দারিদ্র সীমার আয় জানা থাকলে দারিদ্র সংক্রান্ত কয়েকটি সামগ্রিক পরিমাপ (Aggregate Measure) হিসাব করা যায়। বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র বিষয়ক ম্যানুয়াল, ২০০৫ অনুসরণে দারিদ্র পরিমাপের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক পরিমাপ পদ্ধতি নিম্নে আলোচিত হলোঃ

১. **হেডকাউন্ট ইনডেক্স (Head Count Index):** হেডকাউন্ট ইনডেক্স দ্বারা একটি দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত জানা যায়। মনে করা যাক একটি দেশের হেডকাউন্ট ইনডেক্সকে P_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তাহলে,

$$P_o = Np/N \text{...........(১)}$$

যেখানে Np =দরিদ্রদের মোট সংখ্যা এবং N = মোট জনসংখ্যা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি একটি জরিপের নমুনাভূক্ত ৫০০ পরিবারের মধ্যে ১৫০টি পরিবার দরিদ্র থাকে, তাহলে P_o =১৫০/৫০০=০.৩০ বা ৩০%। সমীকরণ ১ কে নিম্নোক্তভাবেও লেখা যায়,

$$P_0 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} I\,(y_i < z) \text{.............(২)}$$

এখানে I(.) এমন একটি অপেক্ষক যার মান ১ এবং ০ হতে পারে। যেমন ব্রাকেটের অনুমান সত্য হলে এর মান ১ এবং সত্য না হলে এর মান শূন্য হবে। সুতরাং যদি ব্যক্তির ব্যয় (Y_i) দারিদ্রসীমার আয়ের (z) এর চেয়ে কম হয় তাহলে I(.) এর মান ১ হবে এবং ব্যক্তি দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে। হেডকাউন্ট ইনডেক্স পরিমাপ করা এবং বুঝা খুবই সহজ তবে এর অন্ততপক্ষে ৩ টি দুর্বলতা আছে। প্রথমত এটি দারিদ্রের গভীরতা সম্পর্কে ধারণা দেয় না যা নিম্নের টেবিলের তুলনা হতে সহজেই অনুমান করা যায়,

ক এবং খ দেশের হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার (দারিদ্র সীমার আয়=৫০০)					
	মাথাপিছু ব্যয়				হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার
ক দেশ	১০০	১৫০	৬০০	৬০০	৫০%
খ দেশ	৪৯৫	৪৯৮	৬০০	৬০০	৫০%

স্পষ্টতই ক দেশে দারিদ্রের গভীরতা বেশি অথচ হেডকাউন্ট ইনডেক্স মোতাবেক উভয়ই দেশেই দারিদ্র সমান। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র লোকেরা কতটা দরিদ্র হেডকাউন্ট ইনডেক্স সে সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়না অর্থাৎ দরিদ্র লোকেরা অধিকতর দরিদ্র হতে থাকলেও হেডকাউন্ট ইনডেক্স পরিবর্তন হয় না। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেডকাউন্ট ইনডেক্স দ্বারা পরিবার ভিত্তিক দারিদ্র পরিমাপ করা হয়। যদি কোন একটা পরিমাপে ৩০% পরিবার দরিদ্র পাওয়া যায় তাহলে এমন হতে পারে সে দেশের ৩৫% জনগণ দরিদ্র (যদি দরিদ্র পরিবারের সদস্য সংখ্যা তুলানামূলক বেশি থাকে)।

২. **দারিদ্র ব্যবধান সূচক (Poverty Gap)** ঃ এই সূচক দ্বারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় আয় দারিদ্র রেখার আয়ের তুলনায় কতটা কম আছে তা পরিমাপ করা হয় এবং একে দারিদ্রসীমা আয়ের শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে, দারিদ্র ব্যবধান (G_i) বের করার জন্য দারিদ্র সীমার (z) আয় হতে দরিদ্রদের প্রকৃত আয় (Y_i) বিয়োগ করা হয় এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হবে শূন্য। সূচক আকারে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়,

$$G_i = (z-y_i).I\,(y_i<z) \text{....... (৩)}$$

এক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে দারিদ্র ব্যবধান সূচক (P_1) প্রকাশ করা যায়

$$P_1 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{G_i}{z} \text{......... (৪)}$$

আয় ব্যবধান সূচক মূলতঃ গড় আনুপাতিক (Mean Proportionate) যেখানে যারা দরিদ্র নয় তাদের আয় ব্যবধান শূন্য। একটি দেশের দারিদ্রকে পুরোপুরি নির্মূল করার জন্য যে ন্যুনতম ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তা দারিদ্র ব্যবধান সূচক হতে পরিমাপ করা যায় অর্থাৎ দেশের দারিদ্র শত ভাগ দূর করার জন্য দরিদ্রদের অনুকূলে ন্যুনতম যে পরিমাণ সম্পদ হস্তান্তর করা প্রয়োজন তার পরিমাণ সমাজের প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র ব্যবধান সমূহের সমষ্টি। এই সূচকের একটি বড় ত্রুটি হলো এর দ্বারা দারিদ্রের তীব্রতা পরিমাপ করা যায় না। সাধারণত দরিদ্র লোকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একজন অধিক গরীব লোকের আয় একজন কম গরীব লোকের অনুকূলে স্থানান্তর করা হলে দারিদ্রের পরিমাপ সূচকে এর প্রভাব পড়া বাঞ্চনীয় কিন্তু দারিদ্র ব্যবধান সূচকে এর কোন প্রভাব পড়েনা।

৩. **দারিদ্রের বর্গ ব্যবধান সূচক (Squared Poverty Gap)** ঃ দারিদ্র ব্যবধান সূচকের সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য দারিদ্রের বর্গ ব্যবধান সূচক পরিমাপ করা হয়। এই সূচকে দরিদ্রদের আয় বন্টনের অসমতার অবস্থা প্রতিফলিত হয়। এটি আসলে দারিদ্র সীমার আয়ের অনুপাতে দারিদ্র ব্যবধানের ভারিত যোগফলের (Weighted Sum) সমান যেখানে দারিদ্র ব্যবধান নিজেই ভার হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ ১০% দারিদ্র ব্যবধানের ক্ষেত্রে ১০ ভাগ এবং ৫০% দারিদ্র ব্যবধানের ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ ভার দেয়া হয়। সুতরাং, দারিদ্র ব্যবধানকে বর্গকরণের মাধ্যমে মূলতঃ অধিক দরিদ্র জনগণের দারিদ্র ব্যবধানকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে দারিদ্রের তীব্রতা বা দারিদ্রের বর্গব্যবধান সূচক পরিমাপ করা হয়।

$$P_2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{G_i}{z}\right)^2 \text{.... .... (৫)}$$

উপরোল্লিখিত ৩টি দারিদ্র সূচক মূলত Foster, Greer and Thorbecke (1984) কর্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নোক্ত সাধারণ সূচক হতে উদ্ভূত,

$$P_\alpha = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{G_i}{z}\right)^\alpha,\ (\alpha \geq 0) \text{.............(৬)}$$

যেখানে α দ্বারা দারিদ্র এবং দারিদ্রসীমার আয়ের সাথে দারিদ্র সূচকের সংবেদনশীলতা পরিমাপ করে। যখন α = 0 তখন P_0 কেবল হেডকাউন্ট সূচক, যখন α = ১ তখন P_1 দারিদ্র ব্যবধান সূচক এবং যখন α = ২ তখন P_2 দারিদ্রের তীব্রতা বা দারিদ্রের বর্গব্যবধান সূচক নির্দেশ করে। এভাবে হেডকাউন্ট সূচকের পরিপূরক হিসেবে দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতা সংক্রান্ত সূচক দেশের সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়তা করে।

৩.০ বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা

৩.১ বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে অভূতপূর্ব সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে। মূলতঃ ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতে এই সাফল্যের সূত্রপাত হয়েছে। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ২৪ লাখ। এদের মধ্যে ৬ কোটি ৩৭ লাখ অর্থাৎ ৫৬.৭ শতাংশ লোক দরিদ্র ছিল। এ সময়ে মোট জনসংখ্যার ৪১.১ ভাগ বা ৪ কোটি ৬২ লাখ লোক অতিদরিদ্র ছিল। অতঃপর ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ১.৬০ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমা এবং ৩.০২ শতাংশ জনগণ চরম-দারিদ্র সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ২০১০ সালে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমে ৪ কোটি ৭৬ লাখে (জনসংখ্যার ৩১.৫ শতাংশ) এবং অতিদরিদ্র লোকের সংখ্যা কমে ২ কোটি ৬৬ লাখে (জনসংখ্যার ১৭.৬ শতাংশ) দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, এ সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক গড়ে ১.৬৬ শতাংশ। তদসত্ত্বেও দারিদ্র হ্রাসের হার জোরালো থাকায় দরিদ্র লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমেছে।

হেডকাউন্ট সূচক (Head Count Index)

৩.২ **জাতীয় পর্যায় (National Level) ঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে ১৯৯১-৯২ সালে উচ্চ দরিদ্র রেখার নীচে অবস্থানরত **(Upper Poverty Line)** দারিদ্রের শতকরা হার ছিল ৫৬.৭ ভাগ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখার নিচে অবস্থানরত **(Lower Poverty Line)** দারিদ্রের শতকরা হার ছিল ৪১.১ ভাগ। ২০১০ সালে এই হার যথাক্রমে শতকরা ৩১.৫ ভাগ ও ১৭.৬ ভাগে নেমে এসেছে। উচ্চ দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯১-৯২ হতে ২০১০ পর্যন্ত সময়ে প্রতিবছর গড়ে শতকরা ৩.২১ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে প্রতিবছর গড়ে শতকরা ৪.৬০ ভাগ হারে হেডকাউন্ট দারিদ্র সূচক হ্রাস পেয়েছে। বিবিএস এর সর্বশেষ **HIES**, ২০১০ জরিপে দেখা যায়, ২০০৫-১০ সময়কালে উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে গড়ে যথাক্রমে ৪.৬৭ শতাংশ ও ৬.৮৫ শতাংশ হারে দারিদ্র সূচক হ্রাস পেয়েছে যা দারিদ্র হ্রাসের দীর্ঘকালীন (১৯৯২-২০১০) গড় প্রবণতা যথাক্রমে ৩.২১ এবং ৪.৬০ এর চেয়ে বেশি।

৩.৩ **পল্লী পর্যায় (Rural Level) ঃ** উচ্চ দারিদ্র রেখা মোতাবেক ১৯৯১-৯২ সালে পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৫৮.৮ ভাগ পরিবার দরিদ্র ছিল যা প্রতিবছর গড়ে ২.৮১ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৩৫.২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি ১৯৯১-৯২ সালে বিদ্যমান দারিদ্রের হার ৪৩.৮ ভাগ হতে প্রতিবছর গড়ে ৩.৯৮ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ২১.১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-১০ সময়কালে দারিদ্র ও চরম দারিদ্র হ্রাসের বার্ষিক হার যথাক্রমে শতকরা ৪.২৮ এবং ৫.৯০ ভাগ যা দারিদ্র হ্রাসের দীর্ঘকালীন (১৯৯২-২০১০) গড় প্রবণতা যথাক্রমে ২.৮১ এবং ৩.৯৮ এর চেয়ে বেশি।

সারণি ১ ঃ হেডকাউন্ট দারিদ্র (সিবিএন পদ্ধতি)

সাল	উচ্চ দারিদ্র রেখা			নিম্নদারিদ্র রেখা		
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
২০১০	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	১৭.৬	২১.১	৭.৭
২০০৫	৪০	৪৩.৮	২৮.৪	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
২০০০	৪৮.৯	৫২.৩	৩৫.২	৩৪.৩	৩৭.৯	২০
১৯৯৫-৯৬	৫০.১	৫৪.৫	২৭.৮	৩৫.২	৩৯.৫	১৩.৭
১৯৯১-৯২	৫৬.৭	৫৮.৮	৪২.৮	৪১.১	৪৩.৮	২৪

সূত্রঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র ঃ ১ দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা

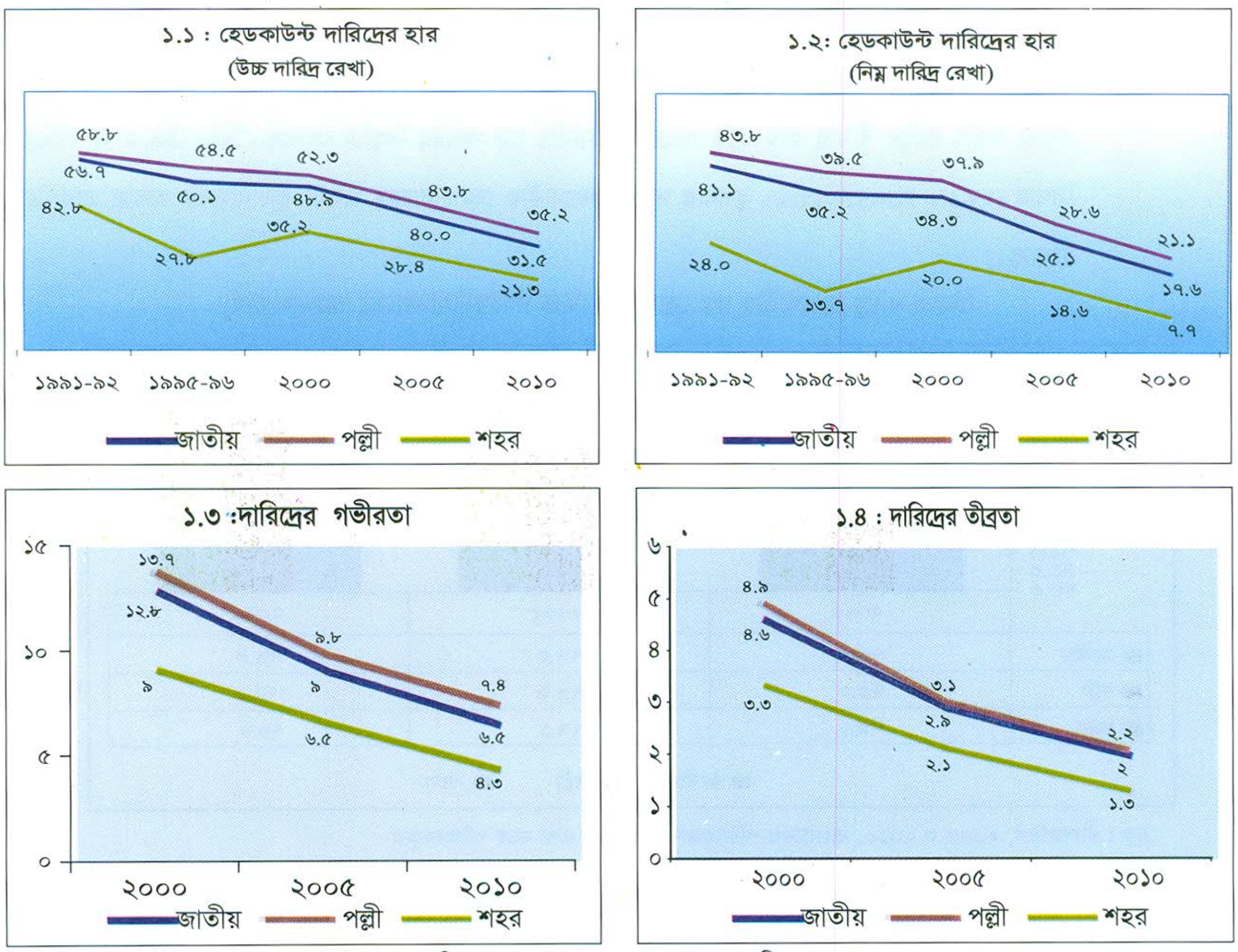

সূত্র: খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৩.৪ **শহর পর্যায় (Urban Level)** ঃলক্ষ্যণীয় যে, শহর অঞ্চলে দারিদ্রের হার পল্লী অঞ্চলের চেয়ে বরাবরই কম। উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুযায়ি ১৯৯১-৯২ সালে শহর অঞ্চলে শতকরা ৪২.৮ ভাগ পরিবার দরিদ্র ছিল যা প্রতিবছর গড়ে ৩.৮০ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ২১.৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। নিম্ন দারিদ্র আয় রেখা অনুযায়ি ১৯৯১-৯২ সালে বিদ্যমান দারিদ্রের হার ২৪.০ ভাগ হতে প্রতিবছর গড়ে ৬.১২ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৭.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-১০ সময়কালে দারিদ্র ও চরম দারিদ্র হ্রাসের হার বার্ষিক যথাক্রমে ৫.৫৯ এবং ১২.০১ ভাগ। অর্থাৎ বর্ণিত সময়ে রেকর্ড পরিমাণ হারে দারিদ্র কমেছে।

সারণি ২ ঃ হেডকাউন্ট সূচকের বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন

		১৯৯২-১৯৯৬	১৯৯৬-২০০০	২০০০-২০০৫	২০০৫-২০১০	১৯৯২-২০১০
উচ্চ দারিদ্র রেখা	জাতীয়	-৩.০৫	-০.৬০	-৩.৯৪	-৪.৬৭	-৩.২১
	পল্লী	-১.৮৮	-১.০২	-৩.৪৯	-৪.২৮	-২.৮১
	শহর	-১০.২৩	৬.০৮	-৪.২০	-৫.৫৯	-৩.৮০
নিম্নদারিদ্র রেখা	জাতীয়	-৩.৮০	-০.৬৫	-৬.০৫	-৬.৮৫	-৪.৬০
	পল্লী	-২.৫৫	-১.০৩	-৫.৪৮	-৫.৯০	-৩.৯৮
	শহর	-১৩.০৮	৯.৯২	-৬.১০	-১২.০১	-৬.১২

সূত্র ঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৩.৫ দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap) ঃ দারিদ্রের গভীরতা

দারিদ্রের হার হ্রাসের পাশাপাশি বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় দারিদ্রের গভীরতাও পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ দারিদ্র সীমার আয় হতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় আয়ের বিস্তৃতি কমেছে। নিম্নে চিত্র-২ এ দারিদ্র রেখার (Upper Poverty Line) তুলনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগ ব্যয়ের একটি তুলনামূলক অবস্থা প্রদর্শিত হয়েছে।

চিত্র-২ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় ভোগ ব্যয় (উচ্চ দারিদ্রসীমা আয়ের শতকরা হার)

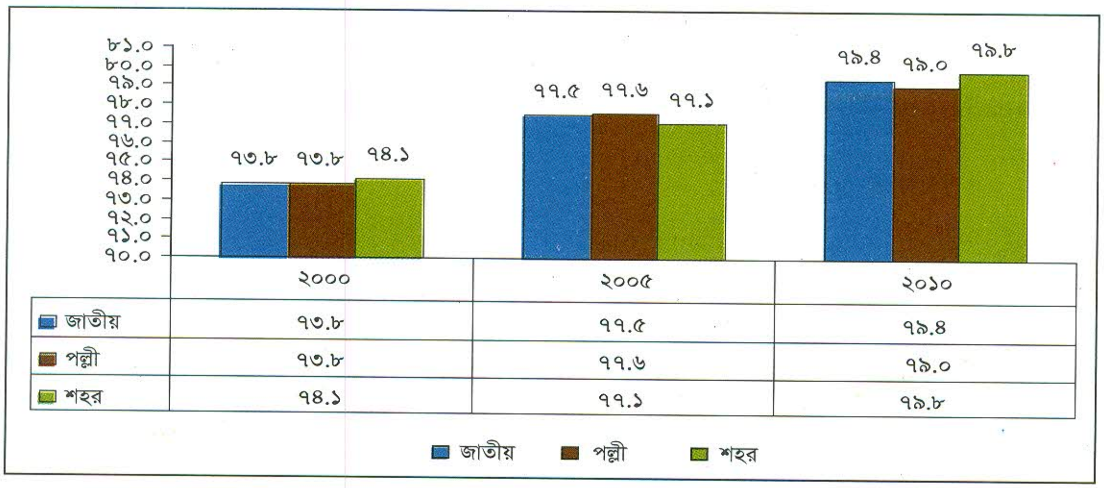

সূত্র ঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তথ্য হতে পরিমাপকৃত

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় পর্যায়ে ২০০০ সালে দরিদ্রদের গড় ভোগ (Consumption) ছিল উচ্চ দারিদ্র সীমার শতকরা ৭৩.৮ ভাগ যা ২০০৫ ও ২০১০ সালে যথাক্রমে ৭৭.৫ ও ৭৯.৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে বর্ণিত সময়ে পল্লী ও শহর উভয় অঞ্চলেই দারিদ্র সীমা অনুপাতে দরিদ্রদের ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ দারিদ্রের গভীরতা কমে আসছে।

৩.৬ **জাতীয় পর্যায় (National Level) ঃ** সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্রের গভীরতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। নিম্ন দারিদ্র সীমা রেখা মোতাবেক জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্রের ব্যবধান ২০০০ সালের ৭.৫ শতাংশ হতে কমে ২০০৫ সালে ৪.৬ শতাংশে এবং ২০১০ সালে ৩.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ দারিদ্র রেখা মোতাবেক এই হার ছিল যথাক্রমে ১২.৮, ৯.০ ও ৬.৫ শতাংশ। ২০০০ হতে ২০১০ সময়কালে দারিদ্র ব্যবধান প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে (সারণী ৩ এবং চিত্র ৩.১)। ১৯৯০ সালে জাতীয় পর্যায়ের দারিদ্রের গভীরতা ছিল শতকরা ১৬ ভাগ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG) অন্যতম লক্ষ্য হলো ২০১৫ সালের মধ্যে তা শতকরা ৮ ভাগে নামিয়ে আনা। লক্ষ্যণীয় যে, দারিদ্র ব্যবধান হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের পাঁচ বছর পূর্বেই দারিদ্রের গভীরতা হ্রাস সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৩.৭ **পল্লী পর্যায় (Rural Poverty) ঃ** পল্লী অঞ্চলে দারিদ্রের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পল্লী অঞ্চলে ২০০৫ সালে উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি এই হার ছিল যথাক্রমে ৯.৮ এবং ৫.৩ শতাংশ যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৭.৪ এবং ৩.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণী ৩ এবং চিত্র ৩.২)।

৩.৮ **শহর পর্যায় (Urban Poverty) ঃ** পল্লী অঞ্চলের অনুরূপ শহরাঞ্চলেও দারিদ্রের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালে উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি এই হার ছিল যথাক্রমে ৬.৫ এবং ২.৬ শতাংশ যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৪.৩ এবং ১.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণী ৩ এবং চিত্র ৩.৩)। লক্ষ্যণীয় যে, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে দারিদ্রের গভীরতা অধিক মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে।

বর্গ দারিদ্র ব্যবধান (Squared Poverty Gap)-দারিদ্রে তীব্রতা ঃ

দারিদ্রের আপতন (Incidence of Poverty) সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারনা পাওয়ার জন্য দারিদ্রের গভীরতার পাশাপাশি দারিদ্রের তীব্রতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বর্গ দারিদ্র ব্যবধান সূচকের সাহায্যে মূলতঃ দারিদ্রের তীব্রতা পরিমাপ করা যায়। দারিদ্রের আয় বন্টনের অসমতার দিকটি এই সূচকে প্রতিফলিত হয়। একটি নির্দিষ্টি সময়কালে এই সূচকের মান কমার অর্থ হচ্ছে দরিদ্রদের আয় বন্টনের অসমতা হ্রাস পাওয়া (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)।

৩.৯ **জাতীয় পর্যায় (National Level) ঃ** সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্রের তীব্রতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্রের তীব্রতা ২০০৫ সালে বিদ্যমান ১.৩ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১০সালে ০.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ দারিদ্র রেখা মোতাবেক এই হার ছিল যথাক্রমে ২.৯ ও ২.০ শতাংশ (সারণী ৩ এবং চিত্র ৩.১)।

৩.১০ **পল্লী পর্যায় (Rural Poverty) ঃ** পল্লী অঞ্চলে দারিদ্রের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। পল্লী অঞ্চলে ২০০৫ সালে উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি এই হার ছিল যথাক্রমে ৩.১ এবং ১.৫ শতাংশ যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ২.২ এবং ১.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণী ৩ এবং চিত্র ৩.২)।

৩.১১ **শহর পর্যায় (Urban Poverty) ঃ** পল্লী অঞ্চলের ন্যায় শহরাঞ্চলেও দারিদ্রের তীব্রতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। শহর অঞ্চলে ২০০৫ সালে উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি এই হার ছিল যথাক্রমে ২.১ এবং ০.৭ শতাংশ যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ১.৩ এবং ০.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণী ৩ এবং চিত্র ৩.৩)।

সারণি ৩ ঃ দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতা (উচ্চ দারিদ্র রেখায় পরিমাপকৃত)

		দারিদ্র ব্যবধান			দারিদ্রের বর্গ ব্যবধান		
		২০০০	২০০৫	২০১০	২০০০	২০০৫	২০১০
উচ্চ দারিদ্র রেখা	জাতীয়	১২.৮	৯.০	৬.৫	৪.৬	২.৯	২.০
	পল্লী	১৩.৭	৯.৮	৭.৪	৪.৯	৩.১	২.২
	শহর	৯.০	৬.৫	৪.৩	৩.৩	২.১	১.৩
নিম্নদারিদ্র রেখা	জাতীয়	৭.৫	৪.৬	৩.১	২.৪	১.৩	০.৮
	পল্লী	৮.৩	৫.৩	৩.৭	২.৬	১.৫	১.০
	শহর	৪.১	২.৬	১.৩	১.২	০.৭	০.৪

সূত্র ঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র ৩ ঃ দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতা (উচ্চ দারিদ্র রেখা)

চিত্র ৩.১ জাতীয়

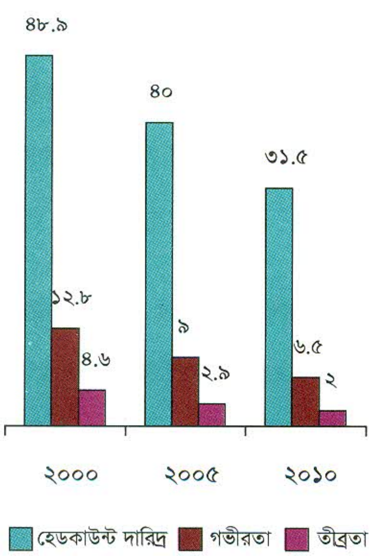

চিত্র ৩.২ পল্লী

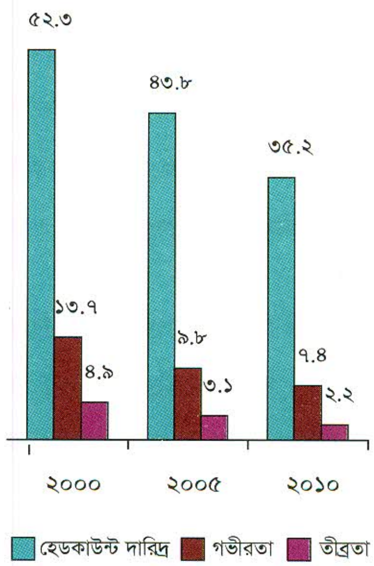

চিত্র ৩.৩ শহর

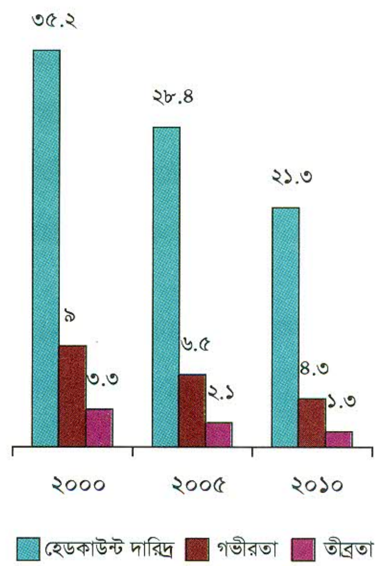

সূত্র ঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৪.০ বাংলাদেশের আঞ্চলিক দারিদ্র

৪.১ হেডকাউন্ট দারিদ্রের আঞ্চলিক আপতনে অসমতা লক্ষ্যণীয়। উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুযায়ি ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ের হেডকাউন্ট দারিদ্র সূচক ৩১.৫ হলেও আঞ্চলিক দারিদ্র সূচকের পরিসর (Range) শতকরা ৩৯.৪ (বরিশাল) হতে ২৬.২ (চট্টগ্রাম) ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই পরিসর শতকরা ৩৯.২ (বরিশাল) হতে ৩০.৫ (সিলেট) ভাগের মধ্যে এবং শহর এলাকায় ৩৯.৯ (বরিশাল) হতে ১১.৮ (চট্টগ্রাম) ভাগের মধ্যে সীমিত ছিল। লক্ষ্যণীয় যে, পল্লী এলাকার তুলনায় শহর এলাকার ক্ষেত্রে হেডকাউন্ট দারিদ্র হারের আঞ্চলিক বিস্তৃতি বেশি।

৪.২ প্রশাসনিক বিভাগভিত্তিক হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার সারণী ৪ এ দেখানো হয়েছে। বিবিএস এর হিসাব মোতাবেক উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুযায়ি ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে হেডকাউন্ট দারিদ্রের সর্বোচ্চ হার ছিল বরিশাল বিভাগে। পরবর্তী অবস্থানে ছিল যথাক্রমে সাবেক রাজশাহী বিভাগ, খুলনা বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, সিলেট বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ। তবে নতুন সৃষ্ট রংপুর বিভাগের তথ্য আলাদাভাবে বিবেচনা করলে এই বিভাগের হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়ায়[২]। পল্লী দারিদ্রের ক্ষেত্রে ২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা মোতাবেক হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার সর্বোচ্চ ছিল বরিশাল বিভাগে। পরবর্তী অবস্থানে ছিল যথাক্রমে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগ। শহর দারিদ্রের ক্ষেত্রে ২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুযায়ি হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার সর্বোচ্চ ছিল বরিশাল বিভাগে। পরবর্তী অবস্থানে ছিল যথাক্রমে খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগ।

সারণি ৪ ঃ সিবিএন পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত বিভাগভিত্তিক দারিদ্রের আপতন (হেডকাউন্ট রেট)

	দারিদ্র রেখা ও বিভাগ	২০১০			২০০৫		
		জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
১. নিম্নদারিদ্র রেখা	জাতীয়	১৭.৬	২১.১	৭.৭	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
	বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪
	চট্টগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	১৬.১	১৮.৭	৮.১
	ঢাকা	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮	১৯.৯	২৬.১	৯.৬
	খুলনা	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮
	রাজশাহী	২১.৬	২২.৭	১৫.৬	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪
	সিলেট	২০.৭	২৩.৫	৫.৫	২০.৮	২২.৩	১১.০
২. উচ্চ দারিদ্র রেখা	জাতীয়	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪
	বরিশাল	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪
	চট্টগ্রাম	২৬.২	৩১.০	১১.৮	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮
	ঢাকা	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০	৩২.০	৩৯.০	২০.২
	খুলনা	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২
	রাজশাহী*	৩৫.৭	৩৬.৬	৩০.৭	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২
	সিলেট	২৮.১	৩০.৫	১৫.০	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬

* রাজশাহী বিভাগ বলতে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগকে একত্রে বুঝানো হয়েছে।

সূত্রঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

[২] পৃথকভাবে ২০১০ সালে রংপুর বিভাগে উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা মোতাবেক দারিদ্রের হার ছিল যথাক্রমে ৪৬.২ এবং ৩০.১ ভাগ। রাজশাহী বিভাগ থেকে রংপুর বিভাগের তথ্য আলাদা করলে উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা মোতাবেক রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র যথাক্রমে ২৯.৮ এবং ১৬.৮ ভাগ।

চিত্র ৪ ঃ বিভাগ ভিত্তিক দারিদ্রের আপতন

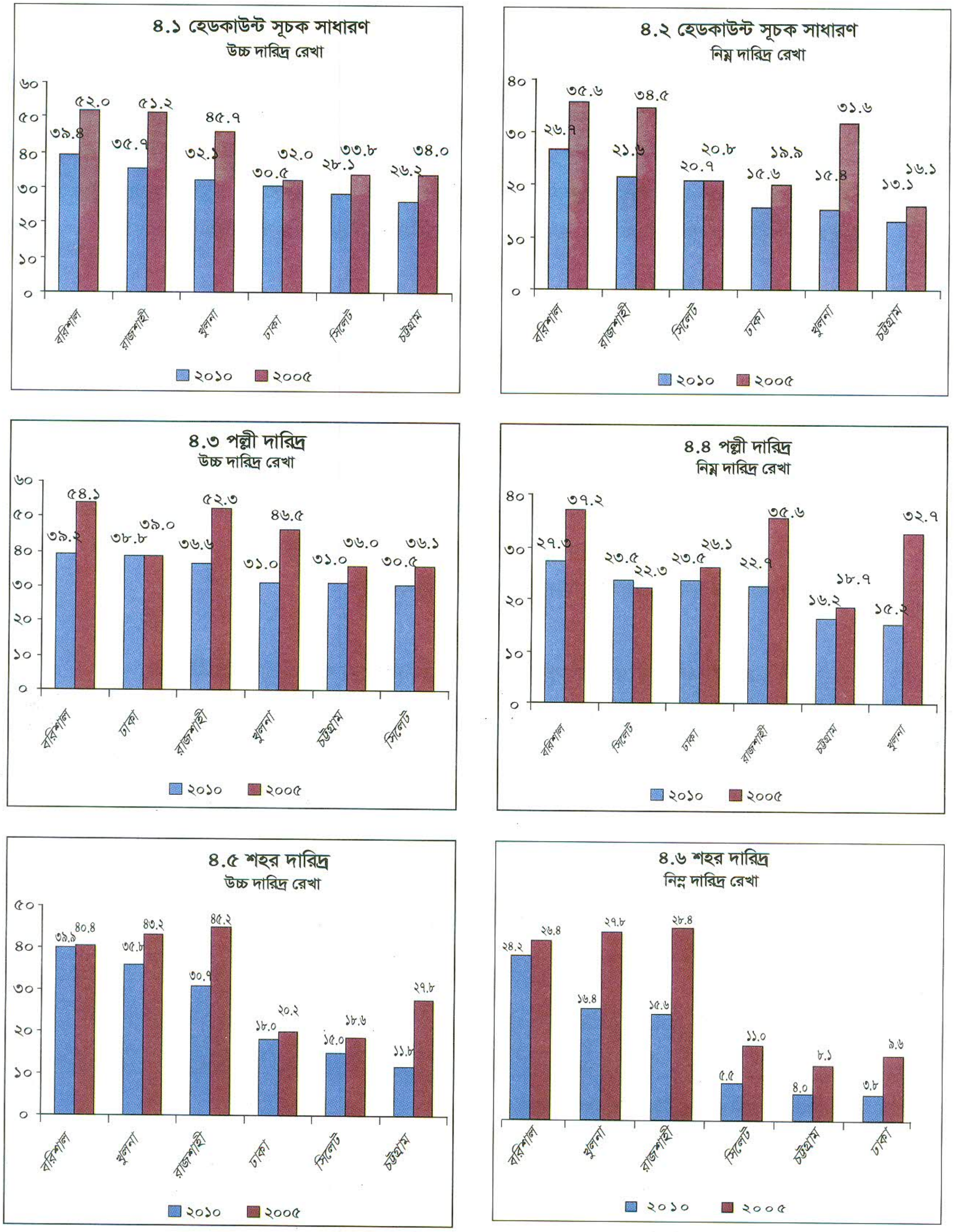

সূত্রঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৪.৩ ২০০৫-১০ সময়ের হেডকাউন্ট দারিদ্রের পরিবর্তন

নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি জাতীয় পর্যায়ে ২০০৫-১০ সময়ে সবচেয়ে বেশি ও দ্রুত হারে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে খুলনা অঞ্চলে (বার্ষিক শতকরা ১৩.৩৯ ভাগ)। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে বার্ষিক শতকরা হিসেবে রাজশাহীতে ৮.৯৪, বরিশালে ৫.৪৯, ঢাকায় ৪.৭৫, চট্টগ্রামে ৪.০৪ এবং সিলেটে ০.১০ শতাংশ হারে দারিদ্র কমেছে।

সারণি ৫ ঃ ২০০৫-১০ সময়ে অঞ্চলভিত্তিক হেডকাউন্ট বার্ষিক দারিদ্র পরিবর্তনের শতকরা হার

দারিদ্র রেখা ও বিভাগ	নিম্নদারিদ্র রেখা			উচ্চ দারিদ্র রেখা		
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	-৬.৮৫	-৫.৯০	-১২.০১	-৪.৬৭	-৪.২৮	-৫.৫৯
বরিশাল	-৫.৫৯	-৬.০০	-১.৭৩	-৫.৪০	-৬.২৪	-০.২৫
চট্টগ্রাম	-৪.০৪	-২.৮৩	-১৩.১৬	-৫.০৮	-২.৯৫	-১৫.৭৫
ঢাকা	-৪.৭৫	-২.০৮	-১৬.৯২	-০.৯৬	-০.১০	-২.২৮
খুলনা	-১৩.৩৯	-১৪.২১	-১০.০২	-৬.৮২	-৭.৭৯	-৩.৬৯
রাজশাহী	-৮.৯৪	-৮.৬১	-১১.২৯	-৬.৯৬	-৬.৮৯	-৭.৪৪
সিলেট	-০.১০	১.০৫	-১২.৯৪	-৩.৬৩	-৩.৩২	-৪.২১

সূত্রঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

উভয় দারিদ্র রেখা মোতাবেক জাতীয় ও শহর অঞ্চলে সকল বিভাগেই দারিদ্রের হার কমেছে। তবে পল্লী অঞ্চলে নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি শুধুমাত্র সিলেট বিভাগে হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার সামান্য বেড়েছে (১.০৫ শতাংশ)। পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বার্ষিক ১৪.২ শতাংশ হারে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে খুলনা বিভাগে। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ যথাক্রমে বার্ষিক ৮.৬, ৬.০, ২.৮ এবং ২.০ শতাংশ হারে দারিদ্র কমেছে।

২০০৫-২০১০ সময়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ি শহরাঞ্চলে সর্বাধিক দারিদ্র কমেছে ঢাকা বিভাগে, শতকরা বার্ষিক ১৬.৯ ভাগ। সবচেয়ে কম দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে বরিশাল বিভাগে, শতকরা বার্ষিক ১.৭ ভাগ। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে চট্টগ্রামে বার্ষিক ১৩.২, সিলেটে বাষিক ১২.৯, রাজশাহীতে বার্ষিক ১১.৩ ও খুলনায় বার্ষিক ১০.০ শতাংশ হারে দারিদ্র কমেছে। উচ্চ দারিদ্র রেখা মোতাবেক দেশের সকল অঞ্চলের দারিদ্র কম-বেশি হ্রাস পেয়েছে। তবে এ সময়কালে দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রাজশাহী এবং সর্বশেষ অবস্থানে ছিল ঢাকা বিভাগ।

৪.৪ দারিদ্রের আঞ্চলিক গভীরতা এবং তীব্রতা

হেডকাউন্ট দারিদ্র হারের আঞ্চলিক বৈচিত্রের মতো দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতার ক্ষেত্রেও কিছুটা আঞ্চলিক তারতম্য রয়েছে (সারণি-৬ দ্রষ্টব্য)। ২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা মোতাবেক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দারিদ্র ব্যবধান এবং দারিদ্র বর্গ ব্যবধান ছিল যথাক্রমে রংপুর এবং সিলেট বিভাগে। তবে দারিদ্রের গভীরতা এবং হেডকাউন্ট দারিদ্রের অনুপাত বিশ্লেষণে দেখা যায় বরিশাল বিভাগের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র সীমার আয় অনুপাতে গড় ভোগ সবচেয়ে কম ছিল (সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৬ ঃ দারিদ্রের আঞ্চলিক গভীরতা এবং তীব্রতা

	নিম্নদারিদ্র রেখা						উচ্চ দারিদ্র রেখা					
	দারিদ্র ব্যবধান			দারিদ্র বর্গ ব্যবধান			দারিদ্র ব্যবধান			দারিদ্র বর্গ ব্যবধান		
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	৩.১	৩.৭	১.৩	০.৮	১	০.৪	৬.৫	৭.৪	৪.৩	২.০	২.২	১.৩
বরিশাল	৫.৪	৫.৪	৫.২	১.৬	১.৬	১.৭	৯.৮	৯.২	১২.৬	৩.৪	৩	৫.২
চম্লগ্রাম	২.২	২.৭	০.৮	০.৬	০.৭	০.২	৫.১	৬.১	২.১	১.৫	১.৮	০.৬
ঢাকা	২.৭	৪.১	০.৫	০.৭	১.১	০.১	৬.২	৮.১	৩.৩	১.৮	২.৪	০.৯
খুলনা	২.৭	২.৭	২.৬	০.৮	০.৮	০.৭	৬.৪	৬.১	৭.৪	২	১.৯	২.৩
রাজশাহী	২.৮	২.৯	২.৩	০.৭	০.৭	০.৬	৬.২	৬.৪	৫.৬	১.৯	১.৯	১.৭
রংপুর	৫.৫	৫.৬	৪.০	১.৪	১.৪	১.০	১১.০	১১.৩	৮.৬	৩.৫	৩.৬	২.৭
সিলেট	৩.৩	৩.৭	১.২	০.৯	১.০	০.৪	৪.৭	৫.০	২.৭	১.৩	১.৩	০.৯

সূত্র: খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র ৫ ঃ দারিদ্রের অঞ্চলভিত্তিক গভীরতা এবং তীব্রতা

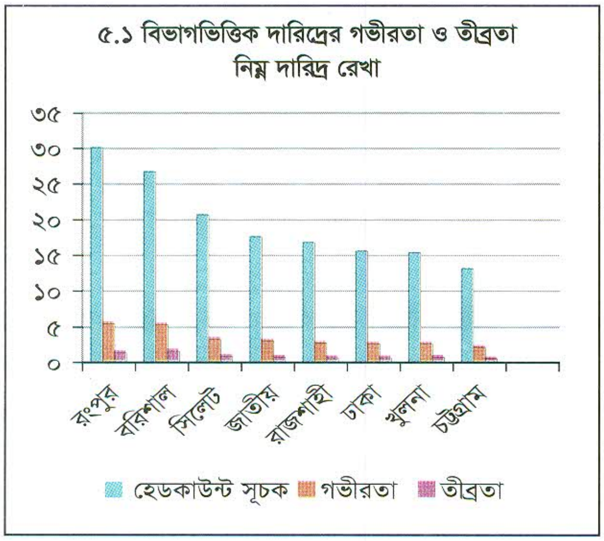

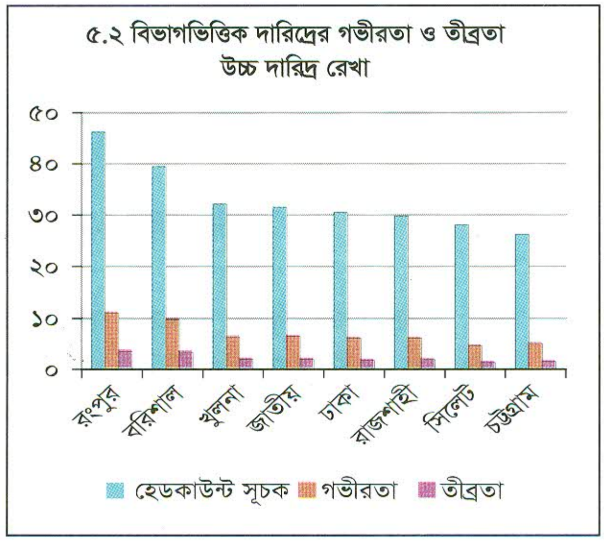

সারণি-৭ঃ বিভাগওয়ারী দারিদ্র সীমার গড় ভোগ ও গড় ঘাটতি

বিভাগ	বরিশাল	রংপুর	রাজশাহী	ঢাকা	খুলনা	চট্টগ্রাম	সিলেট	জাতীয়
দারিদ্র সীমার আয়	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
দরিদ্র শ্রেণীর গড় ভোগ	৭৫.১৩	৭৬.১৯	৭৯.১৯	৭৯.৬৭	৮০.০৬	৮০.৫৩	৮৩.২৭	৭৯.৩৭
গড় ঘাটতি	২৪.৮৭	২৩.৮১	২০.৮১	২০.৩৩	১৯.৯৪	১৯.৪৭	১৬.৭৩	২০.৬৩

সূত্রঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৫.০ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দারিদ্র ও অসমতা

৫.১ এ অধ্যায়ে, বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে ২০০৩ হতে ২০১২ সময়কালে বিশ্বের ১৪৬ টি দেশের সাথে বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

হেডকাউন্ট (Head Count Index) দারিদ্র পরিস্থিতি :

৫.২ ২০০৫ সালে বাংলাদেশের হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার ছিল শতকরা ৪০ শতাংশ যা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫১ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৩ হতে ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশের গড় প্রকৃত মাথাপিছু আয় ছিল ৪৮২.৯ মার্কিন ডলার[৩] । বাংলাদেশের মত এত স্বল্প মাথাপিছু আয় নিয়ে অধিকাংশ দেশই দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ন্যায় সাফল্য দেখাতে পারেনি। লক্ষ্যণীয় যে, একই সময়ে মেক্সিকোর গড় মাথাপিছু আয় ৮,০৬৬ ডলারের বিপরীতে তাদের হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার ছিল প্রায় ৪২.৯ শতাংশ। (সারণি-৮ দ্রষ্টব্য)। আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত ধনী দেশ গ্যাবনের মাথাপিছু আয় ৬,৩১৫ ডলারের বিপরীতে হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার ছিল ৩২.৭ ভাগ। প্রতিবেশি দেশ ভারতের মাথাপিছু গড় আয় ৮৮০.৯ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্রের হার ছিল ২১.৯ শতাংশ।

সারণি ৮ঃ বিভিন্ন দেশের তুলনায় হেডকাউন্ট রেটে বাংলাদেশের অবস্থান (২০০৩-২০১৩)

দেশের নাম	মাথাপিছু গড় প্রকৃত আয়[৪]	হেডকাউন্ট দারিদ্র	দারিদ্র ব্যবধান (সর্ব নিম্ন)	গিনি সূচক (সর্ব নিম্ন)
বাংলাদেশ	৪৮২.৯	৩১.৫	৬.৫৪	৩২.১২
ভারত	৮৮০.৯	২১.৯	৪.০	৩৩.৪
মেক্সিকো	৮,০৬৬	৪২.৯	-	৪৬.০৫
গ্যাবন	৬,৩১৫	৩২.৭	১০	৪১.৪৫
ডমিনিকান রিপাবলিক	৪,২২৫	৪০.৪	-	৪৭.২
হন্ডুরাস	১,৪৭১	৫৮.৩	-	৫৬.২

সূত্রঃ World Development Indicator, 2013,World Bank

পরিশিষ্ট-১ এর সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, মাথাপিছু আয়ের উর্ধ্বক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৫ তম। লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের চেয়ে কম মাথাপিছু আয় নিয়ে কেবল উগান্ডা, নেপাল, তাঞ্জানিয়া এবং ইথিওপিয়া বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল। অবশিষ্ট ১৯টি দেশের অবস্থান বাংলাদেশের নীচে ছিল। অন্যদিকে, বাংলাদেশের চেয়ে বেশি মাথাপিছু আয় থাকা সত্ত্বেও সোয়াজিল্যান্ড, সাওতমে ও প্রিন্সিপে, জাম্বিয়া, হন্ডুরাস, লেসোথো, বলিভিয়া, গুয়েতেমালা, তিমুর-লেসতে, চাদ, সেনেগাল, সুদান, কঙ্গো, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, কমোরোস, মেক্সিকো, আইভোরি কোস্ট, নিকারাগুয়া, মৌরিতানিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পাপুয়া নিউগিনি,

[৩]২০০৫ সালের স্থির ডলার মূল্য

[৪]২০০৫ সালের স্থির ডলার মূল্য এবং ২০০৩ হতে ২০১২ সময়ের গড়

ক্যামেরুন, এ্যাঙ্গোলা, ফিজি, ইয়েমেন, বেনিন, কলোম্বিয়া, গ্যাবন এবং প্যারাগুয়ের দারিদ্র পরিস্থিতি তথা হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ছিল।

দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap)

৫.৩ ২০০৩ হতে ২০১২ সময়ে বিশ্বের ৭৯টি দেশের দারিদ্র ব্যবধান সূচকের গড় মান ছিল ১১.৯২ যেখানে মধ্যক ৯.৩০, সর্বোচ্চ মান ৩৭.৯ (প্যারাগুয়ে) এবং সর্বনিম্ন মান ০.৪০ (ইউক্রেন)। এ সময়ে বাংলাদেশের দারিদ্র ব্যবধান সূচকের গড় মান ছিল ৬.৫৪ যা বিশ্বের ৭৯টি দেশের গড় ও মধ্যক মানের তুলনায় কম। বর্ণিত নমুনায় দারিদ্র ব্যবধানের উর্দ্ধক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান ২৮তম। অর্থাৎ ২৭টি দেশের দারিদ্র ব্যবধান বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্র ব্যবধানের চেয়ে কম। তবে এই ২৭টির মধ্যে ২৬টি দেশেরই ২০০৩-১২ সময়ের মাথাপিছু গড় আয় বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয়ের চেয়ে বেশি। মাথাপিছু গড় আয় বেশি থাকলে দারিদ্র ব্যবধান কমিয়ে আনার সক্ষমতাও বেশি থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের তুলনায় মাথাপিছু আয় বেশি অথচ দারিদ্র ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশের তুলনায় সফল নয় এমন দেশের সংখ্যাও অনেক। বাংলাদেশের তুলনায় অধিকতর মাথাপিছু আয় থাকা সত্ত্বেও যে সব দেশ দারিদ্র ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশের পিছনে পড়ে আছে তাদের মধ্যে রয়েছে- বেনিন, কেনিয়া, তিমুর-লেসতে, ঘানা, কমোরোস, চাদ, জাম্বিয়া, সুদান, মৌরিতানিয়া, সাওতমে ও প্রিন্সিপে, সেনেগাল, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, ক্যামেরুন, আইভরি কোস্ট, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, প্যারাগুয়ে, এ্যাংগোলা, সোয়াজিল্যান্ড, কসোভো, কেপভার্দে, পেরু, ফিজি, কলোম্বিয়া, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বতসোয়ানা, গ্যাবন এবং সিসিলি। বাংলাদেশের চেয়ে কম মাথাপিছু আয় নিয়ে নেপাল ব্যতীত অন্য কোন দেশ দারিদ্র ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশের মত সফলতা দেখাতে পারেনি। অন্যদিকে হেডকাউন্ট দারিদ্র কমাতে বাংলাদেশের চেয়ে অধিক সফল কিন্তু দারিদ্র ব্যবধান বা দারিদ্রের গভীরতা কমাতে বাংলাদেশের পিছনে আছে এমন দেশের মধ্যে রয়েছে উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, পেরু, কসোভো, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ইথিওপিয়া, কেপভার্দে, নামিবিয়া, সিসিলি, ঘানা এবং বতসোয়ানা। সুতরাং হেডকাউন্ট দারিদ্র হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্রের গভীরতা কমাতে এরূপ ঈর্ষণীয় সফলতা বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতাকে বিশ্ব পরিমন্ডলে গুণগতমানের বিচারে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে।

অসমতা পরিস্থিতি

৫.৪ গিনি সূচক (Consumption Gini Index) সংক্রান্ত ১১৩টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের অসমতার মাত্রা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। দেখা যায়, ১১৩টি দেশের গিনি- সূচকের গড় মান ছিল ৩৯.৯৪ যেখানে মধ্যক মান হল ৩৮.৭৩ সর্বোচ্চ মান ৬৫.৭৭ এবং সর্বনিম্ন মান হল ২৪.২৪ (সারণি ৯)। এ সময়কালে বাংলাদেশের গিনি সূচকের মান ছিল ৩২.১২ যা বিশ্বে বিদ্যমান গড় ও মধ্যক মানের তুলনায় কম। উন্নত অবস্থান অনুযায়ি বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২০তম, যেখানে ভারতের অবস্থান ২৭তম এবং শ্রীলংকার অবস্থান ছিল ৪৪তম। বাংলাদেশের চেয়ে গিনি সূচকের মান ভাল ছিল এমন দেশগুলোর মধ্যে কেবল ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তান বাদে অন্য ১৩টি দেশের মাথাপিছু আয়

বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ছিল। সুতরাং মাথাপিছু আয়ের বিচারে বাংলাদেশের গিনি সূচকের মান বিশ্বের সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় খুবই প্রশংসনীয় পর্যায়ে ছিল।

সারণি ৯ ঃ বিশ্ব অসমতা পরিস্থিতি (২০০৩-২০১৩)

সূচক	দেশের সংখ্যা	গড়মান	মধ্যক মান	সর্বোচ্চ মান	সর্বনিম্ন মান	পরিমিত ব্যবধান	বাংলাদেশ
গিনিসূচক	১১৩	৩৯.৯৪	৩৮.৭৩	৬৫.৭৭	২৪.২৪	৮.৭১	৩২.১২
দরিদ্রতম ১০ শতাংশ*	১১২	২.৫০	২.৬৪	৪.১৪	০.৫২	০.৯৩	৩.৯৯
সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশ*	১১২	৩২.৮৫	৩১.২৬	৬০.১৬	২২.১৮	৭.১৭	২৭.৫৭

* জনগোষ্ঠীর অধিকারে মোট আয়ের অংশ

৫.৫ দেশের অসমতা অবস্থা অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশের হাতে দেশের মোট আয়ের কত শতাংশ আছে তা জানা। বর্ণিত নমুনার মোট ১১২টি দেশের আয়বন্টন সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর হাতে দেশের মোট আয়ের ৩.৯৯ বা ৪ শতাংশ পুঞ্জিভূত আছে। লক্ষ্যণীয়, ১১২টি দেশের মধ্যে ১০৭টি দেশই বাংলাদেশের পিছনে। দরিদ্রতম ১০ ভাগ জনগোষ্ঠির তথ্যের পরিসংখ্যানগত সারসংক্ষেপ (সারণী-৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১১২টি দেশে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির হাতে গড়ে ২.৫ শতাংশ আয় ছিল যা সর্বোচ্চ ৪.১৪ (বুরুন্ডি) এবং সর্বনিম্ন ০.৫২ (বলিভিয়া) এর মধ্যে বিস্তৃত ছিল। সুতরাং দরিদ্রতম ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর অধিকারভূক্ত আয়ের বিচারে বাংলাদেশের সমতুল্য সুষম আয়ের দেশ বিশ্বে কমই আছে।

৫.৬ জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের হাতে দেশের মোট আয়ের কত অংশ পুঞ্জীভূত আছে তা থেকেও অসমতা অবস্থা অনুমান করা যায়। দেশের সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশের হাতে দেশের মোট আয়ের বেশির ভাগই পুঞ্জীভূত থাকলে সমাজে চরম অসমতাবস্থা বিরাজ করছে বলে গণ্য করা হয়। নমুনাভূক্ত দেশসমূহের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১১২টি দেশের সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠী গড়ে দেশের মোট আয়ের ৩২.৮৫ শতাংশ ধারণ করে। তবে এর মান সর্বোচ্চ ৬০.১৬ (সিসিলিস) এবং সর্বনিম্ন ২২.১৮ (বেলারুশ) এর মধ্যে বিস্তৃত যার মধ্যক মান ৩১.২৬। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশের হাতে দেশের মোট আয়ের ২৭.৫৭ শতাংশ আছে যা বিশ্বের ১১২টি দেশের গড় এবং মধ্যক মানের তুলনায় কম। মূলতঃ ১১২টি দেশের মধ্যে উন্নত অবস্থান অনুযায়ি বাংলাদেশ ২৪তম অবস্থানে আছে যেখানে ভারত ৩৫তম, শ্রীলংকা ৫৯তম এবং নেপাল ৬১তম অবস্থানে আছে। সুতরাং সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ধনী লোকদের আয়ের অংশ বিচারে বাংলাদেশের অসমতা খুবই কম পরিলক্ষিত হয়।

৬.০ বাংলাদেশের অসমতার পরিবর্তন

৬.১ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কুজনেটস (১৯৫৫) এর তত্ত্বানুসারে বিকাশমান অর্থনীতিতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয় বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অসমতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ১৯৯৬ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও অসমতা অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। তবে ২০০০ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়কালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও অসমতা কিছুটা কমেছে। দেশের আয়বন্টন কাঠামো বিশ্লেষণের জন্য দশমাংশভিত্তিক আয় ও ভোগ বন্টন, আয় ও ভোগভিত্তিক লরেঞ্জ রেখা এবং গিনিসূচকের ধারণা ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তির দারিদ্র যেহেতু তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত পণ্য প্রাপ্তির সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল; সেহেতু সমাজের আয় বন্টন কাঠামোর চেয়ে ভোগ বন্টন কাঠামোর বর্ণনা দারিদ্র বিশ্লেষণের জন্য অধিক প্রাসঙ্গিক। সুতরাং অর্থবহ বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বাংলাদেশের দারিদ্রের সাথে অসমতা পরিস্থিতির বর্ণনায় ভোগভিত্তিক অসমতা সূচকগুলোর উপর অধিক আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অসমতার চিত্রঃ দশমাংশভিত্তিক আয় ও ভোগ বন্টন

৬.২ বাংলাদেশের অসমতা পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে ২০০৫-২০১০ সালের দশমাংশভিত্তিক আয় এ ভোগ বন্টন নিম্নের সারণিতে বিশ্লেষণ করা হলো:

সারণি ১০ ঃ দশমাংশভিত্তিক আয় বন্টন এবং গিনি সূচক

আয়ের শ্রেণী	২০১০			২০০৫			২০০৫-২০১০ সময়ে শতকরা পরিবর্তন		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর			
জাতীয়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	মোট	পল্লী	শহর
সর্ব নিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭	১.৩	০.০	১৩.৪
দশক-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০	০.০	-০.৯	১০.০
দশক-২	৩.২২	৩.৩৫	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২	-১.২	-৭.৭	২.৩
দশক-৩	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭	০.০	-১.১	২.১
দশক-৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১	০.০	০.২	৮.৭
দশক-৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬	০.৮	০.০	১১.৫
দশক-৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮	২.১	০.৩	১২.৭
দশক-৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩	৩.৮	০.৪	৯.০
দশক-৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮	৪.০	০.১	১৬.৬
দশক-৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮	৫.৮	০.৭	১১.০
দশক-১০	৩৫.৮৫	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮	-৪.৮	-০.১	-১৫.৪
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭	-৮.৬	-০.৪	-২৩.০
আয় গিনিসূচক	০.৪৫৮	০.৪৩১	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭	-১.৯	০.৭	-৯.১

সূত্রঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণি ১০ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে ২০০৫ সালে মোট আয়ে দরিদ্রতম শতকরা ৫ ভাগ জনগোষ্ঠীর অংশ ছিল শতকরা ০.৭৭ ভাগ যা ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ০.৭৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ ২০০৫ হতে ২০১০ সালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মোট আয়ে তাদের নিজেদের অংশ শতকরা ১.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী অঞ্চলে দরিদ্রতম ৫ ভাগ জনগোষ্ঠীর আপেক্ষিক অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলেও শহরাঞ্চলের অনুরূপ দরিদ্র জনগণের মোট আয়ে তাদের অংশ বর্ণিত সময়কালে ১৩.৪ শতাংশ বেড়েছে। অনুরূপভাবে জাতীয় পর্যায়ে একই সময়ে দরিদ্রদের দিক হতে প্রথম ১০ ভাগের আয়ের অংশ বাড়েনি, দ্বিতীয় ১০ ভাগের আয়ের অংশ ১.২ শতাংশ কমেছে, তৃতীয় ও চতুর্থ দশমাংশের আয়ের অংশ অপরিবর্তিত ছিল, পঞ্চম হতে নবম দশমাংশের জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ বেড়েছে। শেষ দশমাংশ বা সবচেয়ে ধনী দশ শতাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে ২০০৫ সালে মোট আয়ের ৩৭.৬৪ শতাংশ এবং সর্বাপেক্ষা ধনী ৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে মোট আয়ের শতকরা ২৬.৯৩ ভাগ আয় ছিল যা যথাক্রমে ৪.৮ এবং ৮.৬ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে যথাক্রমে ৩৫.৮৫ ভাগ এবং ২৪.৬১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। মোট আয়ে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ বৃদ্ধি এবং সর্বাপেক্ষা ধনী জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ কমে যাওয়ার কারণে ২০০৫ হতে ২০১০ সময়কালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বন্টন কিছুটা সুষম হয়েছে। একইভাবে পল্লী ও শহর উভয় অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা ধনী শ্রেণীর আয়ের অংশ কমেছে এবং সামগ্রিকভাবে ২০০৫ হতে ২০১০ সময়ে শহরাঞ্চলের আয় বন্টনের অসমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে পল্লী অঞ্চলে ২০০৫-২০১০ সময়কালে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ সামান্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আয় বন্টনের অসমতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১১ ঃ দশমাংশভিত্তিক ভোগ বন্টন এবং গিনি সূচক

ভোগ ব্যয়ের দশক	২০১০			২০০৫			২০০৫-২০১০ সময়ে শতকরা পরিবর্তন		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর			
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	মোট	পল্লী	শহর
দশক-১	৩.৮৫	৪.৩৬	৩.৪	৩.৮৫	৪:৩৭	৩.১৫	০.০০	-০.২৩	৭.৯৪
দশক-২	৫.০০	৫.৫৭	৪.৬৬	৪.৯১	৫.৪৯	৪.৩১	১.৮৩	১.৪৬	৮.১২
দশক-৩	৫.৮৪	৬.৪১	৫.৫৪	৫.৭১	৬.৩	৫.১৪	২.২৮	১.৭৫	৭.৭৮
দশক-৪	৬.৬৩	৭.২২	৬.৪২	৬.৪৭	৭.০৮	৬.০৭	২.৪৭	১.৯৮	৫.৭৭
দশক-৫	৭.৪৮	৮.০৩	৭.৩৭	৭.৩১	৭.৯২	৭.১৪	২.৩৩	১.৩৯	৩.২২
দশক-৬	৮.৪৮	৮.৯৭	৮.৪৮	৮.২৮	৮.৮	৮.০৯	২.৪২	১.৯৩	৪.৮২
দশক-৭	৯.৭৩	১০.০১	১০.০১	৭.৫৮	৯.৯৭	৯.৭১	২৮.৩৬	০.৪০	৩.০৯
দশক-৮	১১.৪৯	১১.৬৩	১২.০৩	১১.৩৭	১১.৫৬	১২.০৩	১.০৬	০.৬১	০.০০
দশক-৯	১৪.৫৯	১৪.০৭	১৫.০৬	১৪.৫২	১৪.১৫	১৫.৩৯	০.৪৮	-০.৫৭	-২.১৪
দশক-১০	২৬.৯	২৩.৬৩	২৭.০৩	২৭.৯৯	২৪.৩৬	২৮.৯৬	-৩.৮৯	-৩.০০	-৬.৬৬
ভোগ গিনিসূচক	০.৩২১	০.২৭৫	০.৩৩৮	০.৩৩২	০.২৮৪	০.৩৬৫	-৩.৩১	-৩.১৭	-৭.৪০

সূত্রঃ খানাজরিপ, ২০০৫ ও ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২০০৫ হতে ২০১০ সালের মধ্যে আয় বন্টনের চেয়ে ভোগ বন্টনের ক্ষেত্রে অধিক সমতা অর্জিত হয়েছে। সারণি ১১ হতে বিষয়টি সহজেই লক্ষ্যণীয়। জাতীয় পর্যায়ে ২০০৫-২০১০ সময়ে দেশের সব চেয়ে দরিদ্র এক-দশমাংশ জনগোষ্ঠীর ভোগের অংশ শতকরা ৩.৮৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকলেও দ্বিতীয় হতে নবম দশমাংশ জনগোষ্ঠীর

ভোগের অংশ বেড়েছে। সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগণের ভোগের অংশ ৩.৮৯ শতাংশ হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে ২০০৫-২০১০ সময়কালে ভোগ বন্টন অনেকটাই সুষম হয়েছে। অনুরূপভাবে পল্লী ও শহর উভয় অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে ভোগ বন্টন সুষম হয়েছে তবে ভোগ বন্টন সুষম হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে শহরাঞ্চলে বেশি ছিল।

চিত্র ৬ ঃ দশমাংশ ভিত্তিক ভোগ বন্টন (২০০৫-২০১০)

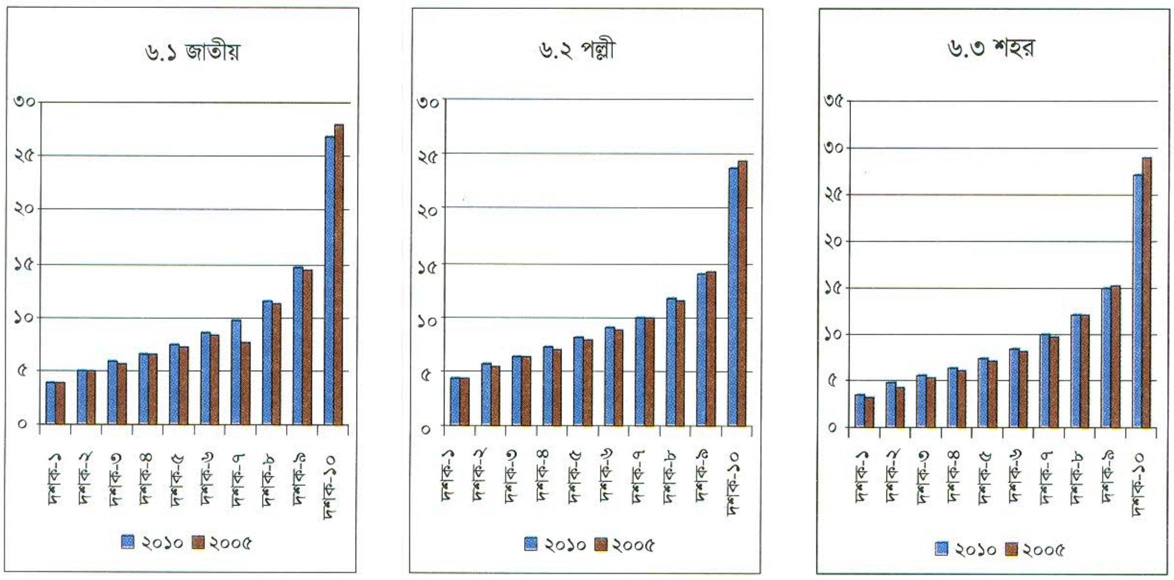

বাংলাদেশের অসমতার চিত্র ঃ লরেঞ্জ রেখা

৬.৩ আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ম্যাক্স লরেঞ্জ (১৯০৫) কর্তৃক উদ্ভাবিত এই রেখার সাহায্যে একটি দেশের সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যায়। এই চিত্রে কোনাকুনিভাবে অংকিত সরল রেখা দ্বারা (৪৫° রেখা) সম্পদ বন্টনের পরিপূর্ণ সমতা নির্দেশ করা হয়। সম্পদ বন্টনের সমতা নির্দেশক সরল রেখার নিচে বিদ্যমান প্রকৃত সম্পদ বন্টন নির্দেশক রেখাকেই লরেঞ্জ রেখা বলা হয়। লরেঞ্জ রেখা মূলতঃ একদিকে দরিদ্রতম ব্যক্তি হতে শুরু করে ক্রমযোজিত (Cumulative) জনসংখ্যা এবং অপরদিকে ক্রমযোজিত জনসংখ্যার বিপরীতে ক্রমযোজিত আয়ের অংশ নির্দেশ করে। লরেঞ্জ রেখা যত বক্র সম্পদ বন্টন তত অসম। মূলতঃ বর্ণিত সরল রেখা এবং লরেঞ্জ রেখার বক্রের মধ্যবর্তী অংশ দ্বারা সম্পদ বন্টনের অসমতা পরিমাপ করা হয়। লরেঞ্জ রেখা দ্বারা সম্পদ বন্টনের মত ভোগ বন্টনের অসমতাও পরিমাপ করা যায়।

চিত্র ৭ ঃ ভোগ লরেঞ্জ রেখা (১৯৯৬-২০১০)

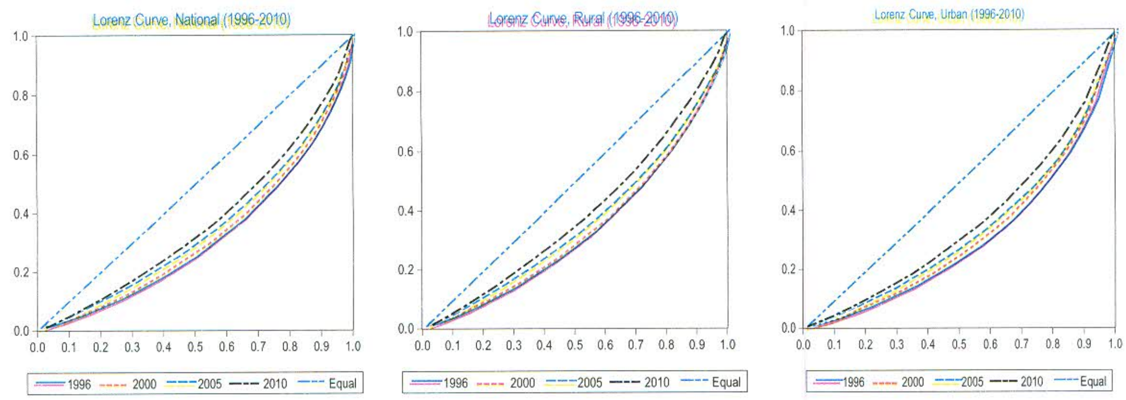

চিত্র ৭ এ ১৯৯৬ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের ভোগ লরেঞ্জ রেখা দেখানো হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ভোগ লরেঞ্জ রেখা (নীল রঙ চিহ্নিত রেখা) সব চেয়ে বক্র ছিল যা তুলনামূলকভাবে ভোগ বন্টনের কম সমতা নির্দেশ করে। এই রেখার বক্রতা ২০০০, ২০০৫ এবং ২০১০ সালে ক্রমান্বয়ে কমেছে। এতে প্রতীয়মান হয় ১৯৯৬ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের ভোগ বন্টনের অসমতা কমেছে। অনুরূপ ঘটনা পল্লী এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে শহরাঞ্চলের তুলনায় অসমতা কম যা এই দু অঞ্চলের লরেঞ্জ রেখা তুলনা করলে বুঝা যায়। চিত্র ৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের লরেঞ্জ রেখা (নীল রঙ চিহ্নিত রেখা) শহর অঞ্চলের রেখার (লাল রঙ চিহ্নিত রেখা) তুলনায় কম বক্র যা পল্লী এলাকার ভোগ বন্টনের তুলনামূলক কম অসমতা নির্দেশ করে।

চিত্র ৮ ঃ লরেঞ্জ রেখা, পল্লী ও শহর (২০০০-২০১০)

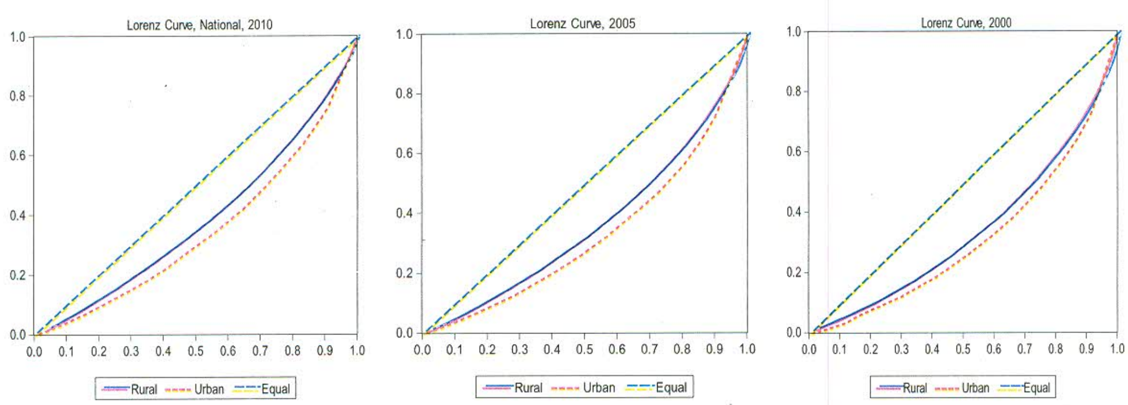

সারণি ১০ এবং ১১ হতে দেখা যায় যে বাংলাদেশে আয় বন্টন ভোগ বন্টনের তুলনায় অধিক অসম যা লরেঞ্জ রেখার মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়। চিত্র ৯ অনুযায়ি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের ভোগ লরেঞ্জ রেখা (লাল রঙ চিহ্নিত রেখা) আয় লরেঞ্জ রেখার (নীল রঙ চিহ্নিত রেখা) তুলনায় সমতা রেখার কাছাকাছি যা আয় বন্টনের তুলনায় ভোগ বন্টনের সুষম অবস্থাকে নির্দেশ করে।

চিত্র ৯ ঃ আয় ও ভোগ লরেঞ্জ রেখা (২০০৫-২০১০)

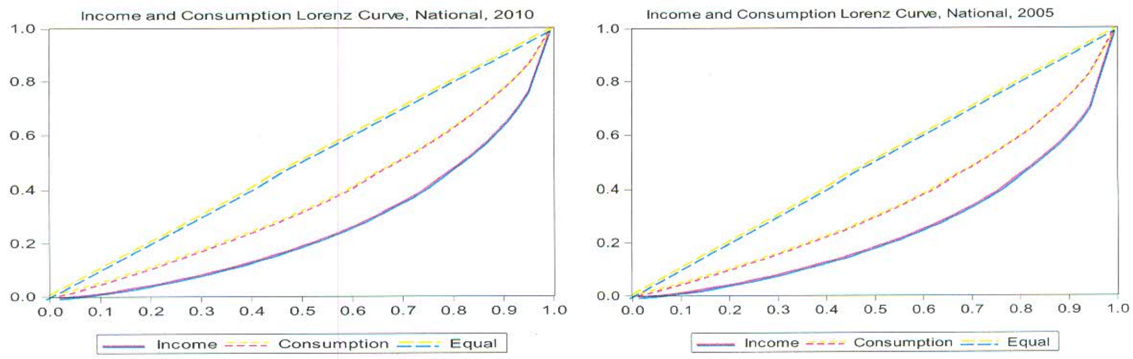

বাংলাদেশের অসমতার চিত্র ঃ গিনি সূচক

৬.৪ গিনি সূচক এমন একটি কম্পোজিট সূচক যার সাহায্যে একনজরে একটি দেশের আয় ও ভোগ বন্টন কাঠামো সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। পরম সুষম অবস্থা হতে সমাজের আয় বন্টন কতটা বিচ্যুত গিনি সূচক তাই পরিমাপ করে। লরেঞ্জ রেখা এবং কল্পিত পরম সুষম আয় বন্টন রেখার (৪৫° রেখা) মধ্যবর্তী এলাকাই হলো গিনি সূচকের সংখ্যাগত মান। এর সংখ্যাগত মান ০ হতে ১ এর মধ্যে হতে পারে। গিনি সূচকের মান শূন্য হলে আয় বা ভোগ বন্টন শতভাগ সুষম এবং এর মান ১ হলে দেশের আয় বা ভোগ বন্টন চরম অসম বলে গণ্য হয়। দেশের গিনি সূচকের মান সময় প্রবাহের সাথে বাড়তে থাকলে দেশটির আয় বন্টন ক্রমশ অসম হচ্ছে মর্মে ধরে নেয়া হয়। চিত্র ১০ এ বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়ের সাথে ভোগ বন্টনের একটি দীর্ঘকালীন সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ১৯৮৪ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ গিনি সূচকের মান বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ আয় বন্টন অসম হয়েছে। ১৯৯৬ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে গিনি সূচকের মান অপরিবর্তিত ছিল। অত:পর ২০০০ হতে ২০১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে গিনি সূচকের মান কমেছে। লক্ষ্যণীয় যে, বর্ণিত সময়কালে দেশের দরিদ্রতম ১০ ভাগ জনগোষ্ঠীর আয় আনুপাতিক হারে তেমন হ্রাস পায়নি বরং তা মোট আয়ের শতকরা ৪ ভাগের মধ্যে স্থির ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ হতে ২০১২ সময়ের মধ্যে বিশ্বের ১১২টি দেশের দরিদ্রতম ১০ ভাগ জনগোষ্ঠীর হাতে গড়ে মোট আয়ের শতকরা ২.৫০ ভাগ ছিল এবং এ সকল দেশের গিনি সূচকের মান ছিল গড়ে ৩৯.৯৪ যা একই সময়ে বাংলাদেশের ভোগ গিনি সূচক (৩২.১২) এর তুলনায় অনেক বেশি (সারণি ৯)। এ থেকে বলা যায় বাংলাদেশের অসমতা পরিস্থিতি বিশেষত ভোগ অসমতা (Consumption Inequality) পরিস্থিতি আশাব্যাঞ্জক ধারায় পরিবর্তিত রয়েছে।

চিত্র ১০ ঃ মাথাপিছু আয় এবং ভোগ গিনি সূচক

	মাথাপিছু জিডিপি*	আয় গিনি সূচক	ভোগ গিনি সূচক	দরিদ্রতম ১০ভাগ**
১৯৮৪	২৫৪.৪	৩৬.০	২৫.৯	৪.১৩
১৯৮৬	২৫৯.৫	৩৭.০	২৬.৯	৪.৪৭
১৯৮৯	৫৯.৫	৩৮.০	২৮.৯	৪.১৬
১৯৯২	২৭৯.৫	৩৯.০	২৭.৬	৪.১৩
১৯৯৬	৩০৬.৮	৪৩.০	৩৩.৫	৩.৯১
২০০০	৩৪৯.৫	৪৫ ০	৩৩.৫	৩.৯১
২০০৫	৪২১.১	৪৬.৭	৩৩.২	৩.৯৮
২০১০	৫৩ .১	৪৫.৮	৩২.১	৩.৯৯

*২০০৫ সালের স্থির ডলার

** মোট আয়ের দরিদ্রতম জনগণের শতকরা অংশ

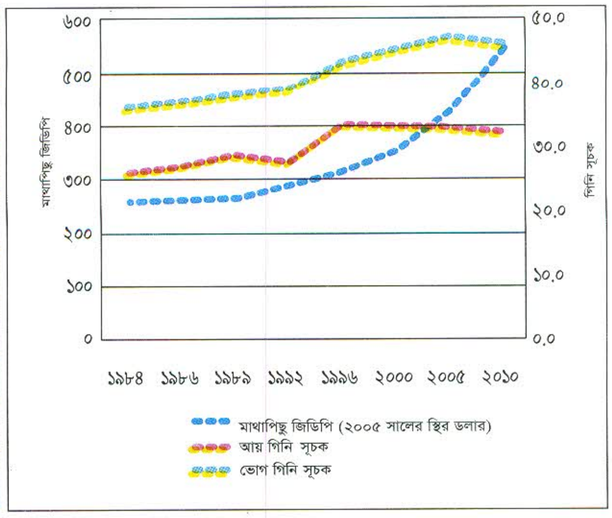

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক

৬.৫ বাংলাদেশের আয় গিনি সূচকের মান কিছুটা উচ্চ পর্যায়ে (০.৪৫) থাকলেও তা দেশের পরম দারিদ্র[৫] (Absolute Poverty) হ্রাসে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেনি। দেশের শিল্প পুঁজির বর্তমান বিকাশকালীন সময়ে আয় গিনি সূচকের কিছুটা উচ্চ মান থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে দরিদ্র নয় এমন ব্যক্তিদের (Non-poor) মধ্যে যদি সম্পদ বন্টনের অতিরিক্ত অসমতা দেখা দেয় তাহলে তা সমাজের আপেক্ষিক দারিদ্র[৬] (Relative Poverty) বাড়াতে পারে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আপেক্ষিক দারিদ্র নিরসনের অংশ হিসেবে আয় পুনর্বন্টমূলক (Income Redistribution) কার্যক্রম জোরদার করলে তা প্রবৃদ্ধি সহায়ক খাতে সম্পদ প্রবাহ সীমিতকরণের মাধ্যমে বর্তমান প্রবৃদ্ধির ধারাকে স্তিমিত করতে পারে। র‍্যাভালিয়ন এবং চেন (১৯৯৭) ৬৭টি উন্নয়নশীল ও Transition Economy-ভূক্ত দেশের ১৯৮১-৮৪ সময়ে তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত গবেষণায় দেখতে পান যে, ব্যক্তিদের জীবন মানের উন্নয়নের সাথে অসমতা এবং দারিদ্রের মেরুকরণ প্রক্রিয়া অনেকটাই সম্পর্কহীন (Un-correlated)। তারা আরো দেখতে পান যে, ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির চেয়ে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অসমতা বাড়ায় এবং সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বাড়লে দারিদ্র কমে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, প্রত্যাশিত ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে এর ব্যতিক্রম ঘটার কোন কারণ দেখা যায় না।

[৫] দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহ সাধারণত পরম দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত।

[৬] আয় বন্টনের অসমতার কারণে ব্যক্তি যখন আপেক্ষিক বঞ্চনা (Relative Deprivation) বোধ করে তখন তাকে আপেক্ষিক দারিদ্র বলা যায়। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল আয় স্তরের জনগোষ্ঠী আয় বন্টন জনিত অসমতার কারণে আপেক্ষিক দারিদ্রতায় ভুগতে পারে।

৭. বাংলাদেশের দারিদ্র ও অসমতার বৈশিষ্ট্য

৭.১ বাংলাদেশের দারিদ্র কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ক্রমবর্ধমান হারে (Increasing Rate) দারিদ্রের হার হ্রাস। সময় প্রবাহের সাথে সাথে বাংলাদেশে ভোগভিত্তিক দারিদ্র হ্রাসের গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের হেডকাউন্ট দারিদ্র সূচক ১৯৯৬-২০০০ সময়ে বার্ষিক শতকরা ০.৬০ হারে, ২০০০-০৫ সময়ে বার্ষিক শতকরা ৩.৯৪ হারে এবং ২০০৫-১০ সময়ে বার্ষিক শতকরা ৪.৬৭ হারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে নিম্ন-দারিদ্র রেখায় পরিমাপকৃত অতি দরিদ্রদের হেডকাউন্ট দারিদ্র সূচক হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ০.৬৫, ৬.০৬ এবং ৬.৮৫ শতাংশ হারে।

চিত্র ১১ ঃ দরিদ্র লোকের সংখ্যা (কোটি)

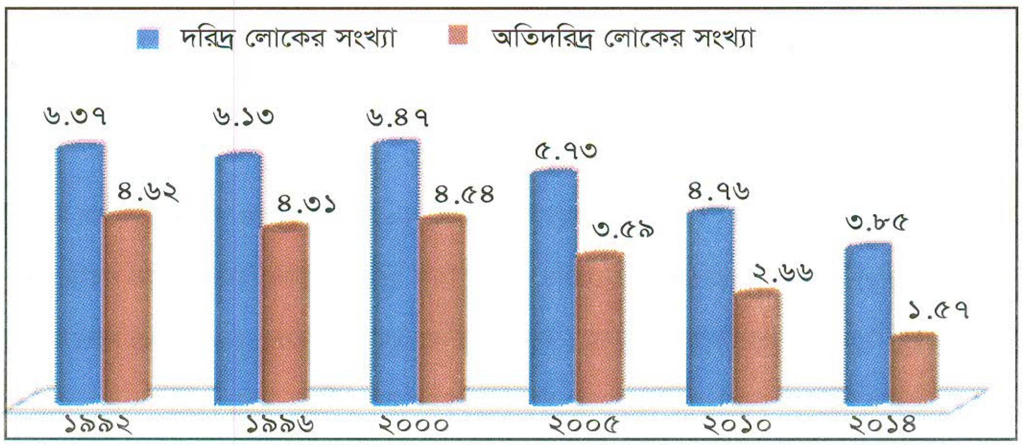

৭.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তারতম্যের কারণে সময় প্রবাহের সাথে সাথে দরিদ্র লোকের সংখ্যা সুষমভাবে হ্রাস পায়নি। ১৯৯২ হতে ২০০০ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ২.০৬ শতাংশ। ফলে এই সময়কালে জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র সূচক যথাক্রমে ৭.৮ এবং ৬.৮ শতাংশ বিন্দু হ্রাস পেলেও দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমেনি বরং কিছুটা বেড়েছে (চিত্র-১১)। অপর দিকে ২০০০ হতে ২০১০ সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে বার্ষিক ১.৩৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে আবার দারিদ্রের হারও কমেছে রেকর্ড পরিমাণে (উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র সূচক যথাক্রমে ১৭.৪ এবং ১৬.৭ শতাংশ বিন্দু হ্রাস পেয়েছে)। ফলে বর্ণিত দশকজুড়ে একটানা দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমেছে। দরিদ্র লোকের মোট সংখ্যা ২০০০ সালের ৬ কোটি ৪৭ লাখ হতে কমে ২০০৫ সালে ৫ কোটি ৭৩ লাখ এবং ২০১০ সালে ৪ কোটি ৭৬ লাখে দাঁড়িয়েছে। অতি দরিদ্রদের সংখ্যা ২০০০ সালের ৪ কোটি ৫৪ লাখ হতে ২০০৫ সালে ৩ কোটি ৫৯ লাখ এবং ২০১০ সালে ২ কোটি ৬৬ লাখে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র হ্রাসের এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত আছে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে এবং ২০১৪ সালে দেশে মোট ৩ কোটি ৮৫ লাখ দরিদ্র এবং ১ কোটি ৫৭ লাখ অতিদরিদ্র লোক রয়েছে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৭.৩ বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দারিদ্র সংক্রান্ত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উভয় লক্ষ্যই অর্জন করতে পারা। দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের

সক্ষমতার বিষয়ে যে পূর্বানুমান ছিল, কার্যত বাংলাদেশ তার চেয়েও অধিক সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্রের ব্যবধান সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের ৫ বছর পূর্বে এবং হেডকাউন্ট দারিদ্র সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের ২ বছর পূর্বেই অর্জন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এই সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।

৭.৪ জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেলেও পল্লী ও শহরাঞ্চলের দারিদ্র হারের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে ২০১০ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৩২.২ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ঠিক একই পরিমাণের দারিদ্র ছিল ২০০০ সালে। অতিদারিদ্র লোকের আধিক্য এখন কেবল পল্লী অঞ্চলে রয়েছে। শহরাঞ্চলের অতিদারিদ্রের হার ২০১০ সালে ৭.৭ শতাংশে দাঁড়ালেও পল্লী অঞ্চলে এই হার ২১.১ এ অবস্থান করছে।

৭.৫ বিবিএস এর খানা জরিপ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের (বরিশাল, খুলনা এবং রাজশাহী) তুলনায় পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং সিলেট) অধিক উন্নতি লাভ করেছে। বিশেষ করে ২০০০ হতে ২০০৫ সময়ে হেডকাউন্ট দারিদ্র চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দেশের পূর্বাঞ্চলের প্রায় সকল বিভাগেই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের বিভাগগুলোর দারিদ্র পরিস্থিতি অনেকটা স্থবির ছিল। তবে ২০০৫ হতে ২০১০ সময়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলো বেশ অগ্রসর হয়েছে। ২০১০ সালের আঞ্চলিক দারিদ্র চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের বিভাগগুলোর দারিদ্র কেবল ব্যাপকভাবে হ্রাসই পায়নি বরং দারিদ্রের মাত্রা অনেকটাই পূর্বাঞ্চলের বিভাগগুলোর কাছাকাছি অবস্থানে এসেছে। দেশব্যাপী সুষম উন্নয়ন সংঘটিত হওয়ার এটি একটি দৃশ্যমান উদাহরণ।

৭.৬ দারিদ্র হ্রাসের পাশাপাশি দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে। ২০০০ হতে ২০০৫ সময়ে দরিদ্র পরিবার সমূহের বাস গৃহ নির্মাণ সামগ্রি উন্নত হয়েছে। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র পরিবার তাদের ঘর-বাড়ির বেড়া, ছাদ ইত্যাদি নির্মাণে টিন, ইস্পাত এবং সিমেন্ট ব্যবহার করেছে। একই সময়ে অধিক সংখ্যক পরিবার উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের আওতায় এসেছে। ২০০৫ থেকে ২০১০ সময়ে পরিবারসমূহের ব্যবহৃত গৃহ নির্মাণ সামগ্রির উন্নতির পাশাপাশি তাদের গৃহ সরঞ্জামাদিরও উন্নয়ন ঘটেছে; যেমন অধিকতর গৃহে মানসম্মত আসবাবপত্র, গোসল খানা, টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে।

৭.৭ ভূমির মালিকানা এবং দারিদ্রের মধ্যকার সম্পর্ক ২০০০-২০১০ সময়ে বেশ পরিবর্তিত হয়েছে। ২০০০-২০০৫ সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক জমির (১.৫ একরের অধিক) মালিকানাধীন পরিবারসমূহের মধ্যে অধিক হারে দারিদ্র কমেছে। কিন্তু ২০০৫ হতে ২০১০ সময়ে অপেক্ষাকৃত কম জমির মালিকানাধীন পরিবারসমূহের দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে অধিক হারে। এটি অবশ্য দারিদ্রের পরিবর্তনের বেলায় সত্য। কিন্তু মালিকানাধীন ভূমির মোট পরিমাণ এবং হেডকাউন্ট দারিদ্র হ্রাসের মধ্যকার সম্পর্ক বরাবরই ঋণাত্মক রয়েছে অর্থাৎ মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণ অধিক হলে হেডকাউন্ট দারিদ্র কম।

৭.৮ দরিদ্র পরিবারসমূহের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য তেমন পরিবর্তিত হয়নি। যেমন দরিদ্র পরিবারগুলোর আকার বড়, নির্ভরশীলতার অনুপাত বেশি, শিশুর সংখ্যা বেশি, অদরিদ্র পরিবারগুলোর পরিবার প্রধানের তুলনায় দরিদ্র পরিবারগুলোর পরিবার প্রধান গড়ে তিন বছরের ছোট এবং দরিদ্র পরিবারগুলোর পরিবার প্রধান অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত।

৭.৯ অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর তুলনায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বরাবরই কম দরিদ্র তথাপি দারিদ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ২০০৫-১০ সময়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর তুলনায় অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি ভাল পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ দারিদ্র রেখা মোতাবেক শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর যথাক্রমে ২৩.০ এবং ৫৪.৭ শতাংশ পরিবার দরিদ্র ছিল যা বার্ষিক ৩.৭ এবং ৪.৮ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে যথাক্রমে ১৯.০ এবং ৪২.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ হলো অদক্ষ শ্রমিকদের আপেক্ষিক মজুরী বৃদ্ধি। মূলতঃ খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী বেড়েছে যা তাদের দারিদ্র হ্রাসে ভূমিকা পালন করেছে।

৭.১০ ২০০৫-২০১০ সময়ে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি তাৎপর্যপূর্ণ। টিকার সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান অনেক কমেছে। তবে পুষ্টি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ধীর। বাংলাদেশ সম্ভবত মডারেট খাদ্য স্বল্পতা (ব্যক্তি প্রতি দৈনিক ২,১২২ কিলো ক্যালরি) ২৪ শতাংশে কমিয়ে আনা সংক্রান্ত সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। ২০১০ সালে ৩৮ শতাংশ লোক মডারেট খাদ্য স্বল্পতায় ভুগতো যা ১ দশকে মাত্র ৬ শতাংশ বিন্দু কমেছে। নিম্ন পুষ্টিগত বৈচিত্র, যা Household Dietary Diversity Score (HDDS) দ্বারা পরিমাপ করা হয়, বাংলাদেশের জন্য এটি একটি চলমান সমস্যা। বাংলাদেশ দারিদ্র হ্রাসের আঞ্চলিক বৈচিত্র হ্রাসে সক্ষম হলেও ২০০৫ সালের এইচডিডিএস স্কোর এবং ২০০৫ ও ২০১০ সময়ের দারিদ্র হ্রাসের সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। অর্থাৎ ২০০৫ সালে যে সব অঞ্চলে দারিদ্রের হার বেশি ছিল ২০০৫-১০ সময়ে সে সব অঞ্চলে অধিকমাত্রায় দারিদ্র কমেছে কিন্তু এইচডিডিএস স্কোর তেমন পরিবর্তন হয়নি।

৭.১১ আঞ্চলিক দারিদ্র হ্রাসে শ্রমিকের আয় এবং পরিবারে প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য অধিক ভূমিকা পালন করছে। তবে এদের ভূমিকা দেশের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলে বেশি ছিল। ভোগ/আয় অনুপাতের পরিবর্তন দেশের পূর্বাঞ্চলের দারিদ্র হ্রাসের সাথে এবং পশ্চিমাঞ্চলের দারিদ্র বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত ছিল। এর ব্যাখ্যা হল ২০০০ সালের তুলনায় ২০১০ সালে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের পরিবারগুলো কম ভোগ এবং বেশি সঞ্চয় করেছে যা প্রদত্ত আয় স্তরে তাদের দারিদ্র বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিমের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের বিভাগগুলোতে স্থানান্তর (Transfer), রেমিটেন্স এবং পরিবারে কর্মজীবী বয়স্ক সদস্যের অনুপাত দারিদ্র হ্রাসে অধিক ভূমিকা পালন করেছে।

৭.১২ পল্লী অঞ্চলের শ্রমিকদের তুলনায় শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫-১০ সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে পল্লী খামার খাতে আত্ম-কর্মরত শ্রম শক্তির। পল্লী অঞ্চলের দিন মজুরদের আয়ও বেড়েছে। পল্লী অঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি তেমন অনুকূল ছিল না। শহরাঞ্চলের দিন মজুর এবং বেতনভূক্ত শ্রমিকদের আয় ২০০০-১০ সময় জুড়ে স্থবির ছিল। অপরদিকে নগরাঞ্চলের খামার বহির্ভূত আত্মকর্মসংস্থান খাতের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী কমেছে। লক্ষ্যণীয় যে, তারপরও পল্লী অঞ্চলের শ্রম-শক্তি সব সময়ই নগরমুখী রয়েছে।

৭.১৩ শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এখনো একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আছে। ২০০০-১০ সময়ে পুরুষদের অংশগ্রহণের হার ৮০ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল ছিল। পক্ষান্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার ২৫ শতাংশ হতে বেড়ে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মহিলাদের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের বৃদ্ধির হার বেশি।

৭.১৪ অকাল বিবাহ এবং অকাল মাতৃত্ব মহিলাদের শ্রম শক্তির অংশ হওয়ার পথে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১০ সালে ২০ হতে ২৪ বছর বয়সী মহিলাদের এক তৃতীয়াংশের বিয়ে হয়েছিল ১৫ বছর বয়সে। বিবাহিত মহিলাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় ২২ শতাংশ কম। অপর দিকে যে সব মহিলাদের ছোট বাচ্চা রয়েছে তাদেরও শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার কম। এ থেকে অনুমেয় অকাল বিবাহ ও অকাল মাতৃত্ব রোধ করতে পারলে নারীদের শ্রমবাজারে অধিকতর অনুপ্রবেশ ঘটবে। শুধু তাই নয় পরিণত বয়সে মাতৃত্ব লাভ করলে সন্তানও স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত হবে।

৭.১৫ ২০০০-১০ সময়ের জনমিতিক চালচিত্র ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের সম্ভাব্য সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দেয়। বিগত ৩০ বছর যাবৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ধীরগতি লাভ করেছে। অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৯৮০ এর দশকের গড় বার্ষিক ২.৭ শতাংশ হতে কমে ২০০০ এর দশকে বার্ষিক ১.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও ২০০০ হতে ২০১০ সময়ে বাংলাদেশে ১.৯ কোটি লোক বৃদ্ধি পেয়েছে (১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০০-২০১০ সময়ে)। তবে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মক্ষম (১৫-৬৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি (২.৩%), যা ইতিবাচক।

৮.০ দারিদ্র নিরসনে সরকারের ভূমিকা, বাজেট ব্যয় ও কার্যক্রমসমূহ

৮.১ বর্তমান সরকারের সময়ে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে সরকারের আর্থিক ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোপূর্বে চলতে থাকা বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ঃ মঙ্গা পীড়িত জেলাসমূহে ন্যাশনাল সার্ভিস চালুকরণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূর করা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধীদের সেবা ও সাহায্য প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তর, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যেমন ঃ পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য কলোনী নির্মাণ, দলিত হরিজন, বেদে এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ইতোপূর্বে বিদ্যমান মুক্তিযোদ্ধা ভাতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ২০১০ সাল হতে শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন প্রদান চালু করা হয়েছে।

সারণি ১২ : সরকারের দারিদ্র বিমোচন ব্যয়

অর্থবছর	মোট সংশোধিত বাজেট ব্যয়	দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় (কোটি টাকায়)	মোট সংশোধিত বাজেট ব্যয়ের শতকরা হারে দারিদ্র বিমোচন ব্যয়	জিডিপি'র শতকরা হারে দারিদ্র বিমোচন ব্যয়
২০০৬-০৭	৬৬৮৩৫	৩৭৪৯৮	৫৬.১১	৮.০২
২০০৭-০৮	৮৬০৮৫	৪৯১৩৩	৫৭.০৭	৯.১৮
২০০৮-০৯	৯৪১৪০	৫৬০৯৫	৫৯.৫৮	৯.১২
২০০৯-১০	১১০৫২৩	৬১৮০৮	৫৫.৯২	৮.৯৫
২০১০-১১	১৩০০১১	৭৩৬৮০	৫৬.৬৭	৯.৩৬
২০১১-১২	১৬১২১৩	৮১৫৭৬	৫০.৬	৮.৯২
২০১২-১৩	১৯১৭৩৮	৯৭৪৪০	৫০.৮২	৯.৩৬
২০১৩-১৪	২১৬২২২	১০৯৩৫৬	৫০.৫৮	৯.২৬

সূত্রঃ আরসিজিপি মডেল[৭] অর্থ বিভাগ

৮.২ দারিদ্র বিমোচনে সরকারের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি অনেক সময় বিভিন্ন প্রকল্পের বিনিয়োগ পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হতে পারে। উপরের সারণি-১২তে[৮] ২০০৬-০৭ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট সংশোধিত বাজেটের শতকরা হারে ও মোট জিডিপি'র শতকরা হারে কি পরিমাণ ব্যয় করা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ধারাবাহিকভাবে মোট সংশোধিত বাজেটের শতকরা হারে দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট জিডিপি'র শতকরা হারে সর্বোচ্চ ৯.৩৬ ভাগ দারিদ্র নিরসনে ব্যয় করা হয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা যায়, মোট সরকারি ব্যয়ের অর্ধেকাংশ প্রতিবছর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারিদ্র নিরসনে ভূমিকা রেখে থাকে যা বিগত কয়েক বছরে জিডিপি'র ৮-৯ ভাগের মধ্যে উঠা-নামা করেছে। পরবর্তী অংশে, সরকার দারিদ্র বিমোচনে কি ধরনের কার্যক্রম, কর্মসূচি, প্রকল্পসমূহ হাতে নিয়েছে এবং এ বাবদ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কি ধরনের সরকারি ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

---

[৭] আর্থিক ব্যবস্থাপনার আরসিজিপি (Recurrent, Current, Gender and Poverty) মডেল অনুসারে সরকারের মোট বাজেটের সার্বিক ব্যয়ের কত অংশ দারিদ্র নিরসনে ব্যয় হয় কিংবা কত অংশ নারী উন্নয়নে ব্যয় হয় তা এ মডেলের সহায়তায় ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের ব্যয়ের হিসেবে দারিদ্র বিমোচনে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়কে অনুমিত করে অর্থবিভাগ হতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

[৮] অর্থ বিভাগের আইবাস সংকলিত তথ্য ভান্ডার ও অর্থবিভাগের ওয়েবসাইট-www.finance.gov.bd

৮.৩ দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

ক) নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম

বিশ্বমন্দার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখা এবং দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজে আশুকরণীয় পদক্ষেপ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা (খাদ্য) খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দারিদ্র বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় ছিল ২৩০৯৭.৫২ কোটি টাকা যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে দাঁড়িয়েছে ২২,১৯৩ কোটি টাকা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) সামনে রেখে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নগদ প্রদানসহ ও (বিভিন্ন ভাতা) অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর জন্য নগদ প্রদান হিসেবে বয়স্ক ভাতা বাবদ ৯৮০.১০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৩৬৪.৩২ কোটি টাকা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বাবদ ৭২০ কোটি টাকা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৩২.১৩ কোটি টাকা, শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বাবদ ১২১.৪০ কোটি টাকা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন বাবদ ২৬ কোটি টাকাসহ মোট ১৪টি কার্যক্রমের অনুকূলে নগদ ভাতা প্রদানের জন্য মোট ৯,৫২২.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহসহ আরো কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

সারণি ১৩ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত [৯]

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	বাজেট ২০১২-১৩ (সংশোধিত)	বাজেট ২০১৩-১৪ (সংশোধিত)	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৪-১৫
নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম	৭৬৩১.৪১	৯৫২২.৮২	১২৩৬২.৮৭
নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রম: সামাজিক ক্ষমতায়ন	৫৯.১২	৬২.১৫	৬৭.১৫
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ: সামাজিক নিরাপত্তা	৭০৭২.৫৫	৮২২৯.৯৬	৮৬৩৮.৪৭
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৩৪২.৭০	৩৪৬.০০	২৪২.০০
বিভিন্ন তহবিল	৩১৯২.৯৬	১৯০০.২৪	১৭৭১.৩৯

সামাজিক ক্ষমতায়নের আওতায় প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্কুলের জন্য মঞ্জুরী বাবদ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে যথাক্রমে ৯.৭ কোটি ও ৫.৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সামাজিক ক্ষমতায়নের নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রমসমূহ হিসেবে গৃহ নির্মাণ সহায়তা খাতে ১৪ কোটি টাকা ও কৃষি পুনর্বাসন খাতে ৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে মূখ্য ভূমিকা রাখছে।

[৯] তথ্য সূত্রঃ অর্থ বিভাগ হতে প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৩ ও অর্থ বিভাগের আইবাস সংকলিত তথ্য ভান্ডার।

খ) খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ

দারিদ্র বিমোচনে হতদরিদ্রদের মাঝে নগদ অর্থের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর (খাদ্য), জিআর (খাদ্য), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম) শীর্ষক বিভিন্ন কার্যক্রম অনেক আগে থেকেই চালু রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্রের নিম্নে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্যক্রমসমূহ মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ছদ্ম বেকারত্ব দূর করে, প্রাকৃতিক দূর্যোগপীড়িত আপদকালীন সময়ে স্থানীয় বাজারে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যজনিত মূল্যস্ফীতি (Food Inflation) নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ বাবদ সরকারের ব্যয় হয়েছে ৭,০৭২.৫৫ কোটি টাকা যা পররর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮,২২৯.৯৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

গ) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

সরকারের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মূলতঃ জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, এনজিও ফাউন্ডেশন, দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক ইত্যাদি উদ্যোগের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩৪২.৭০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৪৬ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে প্রায় ২৪২ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তহবিলসমূহ

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি বেশ কিছু তহবিলও গঠন করেছে যেমনঃ এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল, স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের তহবিলে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৭৪.২৪ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে ১২৬.৪৯ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে প্রায় ১৩১ কোটি টাকার প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ঙ) অন্যান্য তহবিলসমূহ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার এ সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তহবিল গঠন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তহবিল হলো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত তহবিল। ২০০৭ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সিডর ও ২০০৯ সালের আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলবর্তী জেলাসমূহের ক্ষতির ফলে দরিদ্র মহিলা ও শিশুরা এবং সর্বোপরি দরিদ্র জনগোষ্ঠী সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সাথে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ অন্যতম সম্ভাব্য হুমকির সম্মুখীন দেশ হিসেবে উন্নত বিশ্বের নজর কেড়েছে। সে প্রেক্ষাপটে ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৭০০ কোটি টাকার Climate Change Trust Fund তহবিল গঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত এ তহবিলে ২,৫৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মজীবী ল্যাকে-টটিং মা'দের কল্যাণে একটি তহবিল গত অর্থবছরে গঠিত হয়েছে সেখানে এ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৪১.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, আগামী বছরে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। সরকারের অন্যতম দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ন্যাশনাল সার্ভিস। দরিদ্র বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলার বেকার যুবকদের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৪২ হাজার জনমাস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার জন্য ব্যয় হবে ২৩৫ কোটি টাকা। এছাড়াও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের জন্য ৩.২ কোটি টাকা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জন্য ১২.৫০ কোটি টাকা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ১ কোটি টাকা, পেনশন স্কীম চালুর জন্য ১১.৫ কোটি টাকা, সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যেমনঃ পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য কলোনী নির্মাণে ১০ কোটি টাকা, দলিত হরিজন, বেদে এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কতিপয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৮.৪ দারিদ্র বিমোচনে সরকারের চলমান অন্যান্য কর্মসূচির/প্রকল্পের মধ্যে ঘরে ফেরা কর্মসূচি, বিআরডিবি'র ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি), চর জীবীকায়ন কর্মসূচি (সিএল পি) প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দারিদ্র নিরসনে ও মাথাপিছু দারিদ্রের হার হ্রাসে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও দারিদ্র নিরসনে বেসরকারি এনজিওসমূহের ভূমিকা ব্যাপক যা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন এনজিওসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধনপ্রাপ্ত এনজিওসমূহ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে ও নারীর ক্ষমতায়নে যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তা অনস্বীকার্য। এ পুস্তিকায় বিস্তারিত পরিধিতে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়নি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দারিদ্রের হ্রাসে কি কি নিয়ামকসমূহ ভূমিকা রেখেছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৯.০ বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের চালিকা শক্তি

৯.১ এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে যে সব উপাদান নিয়ামক (Determinants) বা চালিকা শক্তি (Driving Force) হিসেবে কাজ করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

৯.২ অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের প্রধান চালিকা শক্তি। ইতোমধ্যে সম্পাদিত বহু গবেষণায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে দারিদ্র হ্রাসের সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে র‍্যাভালিয়ন এবং চেন (১৯৯৭) ও এডামস (২০০৩) এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। এডামস (২০০৩) ৫০টি উন্নয়নশীল দেশের তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা করে দেখান যে, জনগণের গড় আয় ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে ২৫.৯ শতাংশ হারে দারিদ্র কমে। রোমার এবং গুগার্তি (১৯৯৭) এর গবেষণায় দেখা যায় যে, ১০ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় ১০ শতাংশ এবং দরিদ্রতম ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় ৯.২১ শতাংশ হারে বাড়ায়। তবে দেশের সামগ্রিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি আবশ্যিকভাবে দারিদ্র হ্রাসের নিশ্চয়তা দেয় না[১০]। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের আয় বন্টন কাঠামোর পরিবর্তন ঘটতে পারে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি জনিত আয় বন্টন কাঠামো যদি ধনী শ্রেণীর অনুকূলে যায় তাহলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই আয় বৃদ্ধির সুফল পায়না বরং ক্ষেত্রবিশেষে দেশের দারিদ্র বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে[১১]। উচ্চ প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের আয় বন্টন কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলে বর্ধিত আয়ের একটি অংশ দরিদ্রদের নিকট যায়, ফলে তাদের পরম আয় বৃদ্ধি পেয়ে দারিদ্র কিছুটা হ্রাস পায়। প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে যদি আয় বন্টন কাঠামো দরিদ্রদের অনুকূলে পরিবর্তিত হয় তাহলে সামগ্রিক আয় বৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাসে সর্বাধিক সহায়ক হয়।

৯.৩ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি দারিদ্র হ্রাসের পক্ষে অনুকূল ভূমিকা রাখে তাহলে এরূপ প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্র-বান্ধব (Pro-poor Growth) বা অন্তর্ভূক্তিমূলক (Inclusive) প্রবৃদ্ধি বলা হয়। দেশে দরিদ্র-বান্ধব প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হলে প্রবৃদ্ধির সুফল অদরিদ্র লোকের চেয়ে দরিদ্র লোকেরা বেশি ভোগ করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরিদ্র বান্ধব বা অন্তর্ভূক্তিমূলক। এর স্বপক্ষে অনেক যুক্তিই রয়েছে। মূলতঃ, মাথা পিছু আয়ের পরিবর্তন সাপেক্ষে দারিদ্র সূচকের পরিবর্তন (মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি জনিত দারিদ্রের স্থিতিস্থাপকতা) পর্যালোচনা, সমাজের গড় ভোগ ব্যয়ের সাপেক্ষে দারিদ্র সূচকসমূহের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়, প্রবৃদ্ধির আপতন রেখা (Growth Incidence Curve) বিশ্লেষণ, দারিদ্রের পরিবর্তনকে প্রবৃদ্ধি এবং পুনর্বন্টন অংশে বিভাজন এবং সর্বোপরি সামাজিক গতিশীলতা পরিমাপের মাধ্যমে এই দাবী প্রতিষ্ঠা করা যায় যা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

---

[১০] বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য ভান্ডার হতে দেখা যায়, ২০০০-২০১২ সময়কালে ডমিনিকান রিপাবলিকে মাথাপিছু আয় বার্ষিক ৩.৬২ শতাংশ হারে বাড়লেও দেশের দারিদ্র সূচক একই সময়ে বার্ষিক ২.০৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। মিশরে ২০০০-২০১১ সময়কালে বার্ষিক ২.৮৪ শতাংশ আয় বৃদ্ধির বিপরীতে বার্ষিক ৩.৮১ শতাংশ, গুয়েতেমালায় ২০০৬-২০১১ সময়কালে বার্ষিক ০.৭০ শতাংশ আয় বৃদ্ধির বিপরীতে বার্ষিক ১.০৪ শতাংশ, গিনিতে ২০০২-২০১২ সময়কালে বার্ষিক ০.১৩ শতাংশ আয় বৃদ্ধির বিপরীতে বার্ষিক ১.১৮ শতাংশ, মেক্সিকোতে ২০০৬-২০১২ সময়কালে বার্ষিক ০.৭৯ শতাংশ আয় বৃদ্ধির বিপরীতে বার্ষিক ৩.৩৬ শতাংশ এবং মোজাম্বিকে ২০০৩-২০০৯ সময়কালে বার্ষিক ৪.৫১ শতাংশ আয় বৃদ্ধির বিপরীতে বার্ষিক ০.৭৯ শতাংশ হারে হেডকাউন্ট দারিদ্র সূচক (জাতীয় দারিদ্র রেখায় পরিমাপকৃত) বৃদ্ধি পেয়েছে?

[১১] অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি অতিমাত্রায় অসমতা বাড়ায়, তাহলে প্রবৃদ্ধির সুফল অসমতার কুফলের নিকট পরাজিত হয়। ভগবতী (১৯৮৮) এ ধরনের প্রবৃদ্ধিকে সর্বনাশা প্রবৃদ্ধি (immise-rizing growth) বলেছেন। যেমন, ধনী কৃষকেরা উন্নত বীজ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শস্যের উৎপাদন বাড়ালে অনেক সময় শস্যের দাম পড়ে যায়। প্রান্তিক কৃষকদের অনেকেই দ্রুত নয়া প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষম হয় না। ফলে তাদের উৎপাদনও বাড়ে না বরং তাদের উৎপাদিত পণ্য কম দামে বিক্রি করে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা তাদেরকে দারিদ্রে নিপতিত করে। এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে দারিদ্র বাড়াতে পারে।

৯.৪ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাসে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে দারিদ্র হ্রাসের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ে শতকরা বার্ষিক ১ শতাংশ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কারণে হেড কাউন্ট দারিদ্রের হার দীর্ঘকালে অর্থাৎ ১৯৯২ হতে ২০১০ সময় কালে বার্ষিক ০.৮৬ শতাংশ পয়েন্ট এবং অতি সম্প্রতি অর্থাৎ ২০০৫ হতে ২০১০ সালের সর্বশেষ জরিপ সময়কালে বার্ষিক ০.৯২ শতাংশ পয়েন্ট হারে কমেছে (সারণি ১৪)। শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, ২০০০ সালের পর হতে শহর এবং গ্রাম উভয় অঞ্চলেই দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিপরীতে দারিদ্র কমেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় ২০০০ সালের পর হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সব সময় দরিদ্রবান্ধব (Pro-poor Growth) ছিল।

সারণি ১৪ঃ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি জনিত দারিদ্রের স্থিতিস্থাপকতা

সময়কাল		১৯৯২-৯৬	১৯৯৬-০০	২০০০-০৫	২০০৫-১০	১৯৯২-১০
বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের বার্ষিক পরিবর্তন		২.৩৫	৩.৩১	৩.৮০	৫.০৬	৩.৭২
হেড কাউন্ট দারিদ্রের বার্ষিক পরিবর্তন	জাতীয়	-৩.০৫	-০.৬০	-৩.৯৪	-৪.৬৭	-৩.২১
	পল্লী	-১.৮৮	-১.০২	-৩.৪৯	-৪.২৮	-২.৮১
	শহর	-১০.২৩	৬.০৮	-৪.২০	-৫.৫৯	-৩.৮০
মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি জনিত দারিদ্রের স্থিতিস্থাপকতা	জাতীয়	-১.২৯	-০.১৮	-১.০৪	-০.৯২	-০.৮৬
	পল্লী	-০.৮০	-০.৩১	-০.৯২	-০.৮৪	-০.৭৬
	শহর	-৪.৩৪	১.৮৪	-১.১১	-১.১০	-১.০২

উৎস ঃ বিবিএস এর তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক পরিমাপকৃত

৯.৫ দেশের সামগ্রিক গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি সাপেক্ষে দারিদ্র-সূচকগুলোর স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের মাধ্যমেও প্রবৃদ্ধির অন্তর্ভূক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে অবগত হওয়া যায়। প্রবৃদ্ধি অর্ন্তভূক্তিমূলক হলে সমাজের সামগ্রিক ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সকল দারিদ্রসূচক হ্রাস পাওয়া উচিত। বাংলাদেশের জনগণের গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি সাপেক্ষে দারিদ্র সূচকসমূহের স্থিতিস্থাপকতা সবসময়ই ঋণাত্মক ছিল (চিত্র ১২) যা গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির সাথে দারিদ্র সূচকসমূহের হ্রাস পাওয়াকে নির্দেশ করে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৬ হতে ২০১০ পর্যন্ত সময়ে গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির বিপরীতে হেডকাউন্ট দারিদ্র হ্রাসের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ১২.১)। গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির বিপরীতে ক্রমহ্রাসমান হারে দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতাও কমেছে (চিত্র ১২.২ ও ১২.৩)। গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র সূচকসমূহের নিম্নমুখী পতন হতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি যে দরিদ্রবান্ধব তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্র নং-১২ ঃ ভোগ ব্যয় পরিবর্তন সাপেক্ষে দারিদ্র-সূচকসমূহের স্থিতিস্থাপকতা

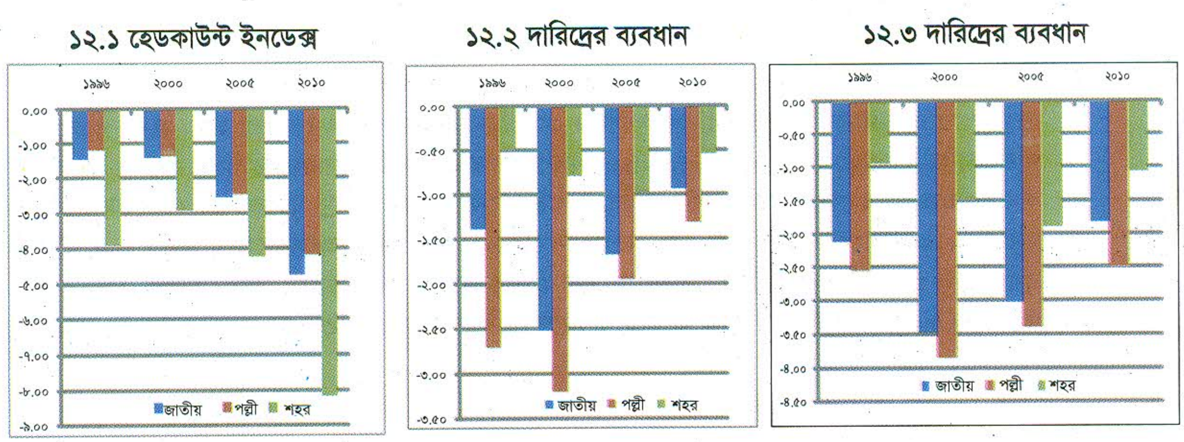

উৎসঃ বিবিএস এর তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক পরিমাপকৃত

৯.৬ প্রবৃদ্ধির আপতন রেখার (Growth Incidence Curve) মাধ্যমেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির দরিদ্রবান্ধব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়। প্রবৃদ্ধির আপতন রেখা দ্বারা দেশের ভোগ বন্টনের পার্সেন্টাইল ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রদর্শিত হয়। ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিভাবে বর্ধিত প্রবৃদ্ধি বন্টিত হচ্ছে তা এই রেখার সাহায্যে সহজেই অনুধাবন করা যায়। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক ২০০০-২০১০ সময়ের বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আপতন রেখা পরিমাপ করেছে (চিত্র ১৩)। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ২০০০-০৫ সময়ে দেশের মাথাপিছু ভোগ বৃদ্ধির সুফল ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সমতার ভিত্তিতে ভোগ করেছে। অবশ্য এ সময়ে অতি ধনী এবং অতি দরিদ্র শ্রেণীর ভোগ বৃদ্ধির হার সমাজের গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় বেশি ছিল (চিত্র ১৩.১)। ২০০৫-১০ সময়ে দেশের ভোগ প্রবৃদ্ধি অধিকতর দরিদ্রবান্ধব ছিল। বিশেষ করে ৫তম পার্সেন্টাইলের উপরের এবং ৮০তম পার্সেন্টাইলের নীচের জনগোষ্ঠীর ভোগ বৃদ্ধির হার সমাজের গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় অধিকতর ছিল (চিত্র ১৩.২)। ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যকার প্রবৃদ্ধির আপতন রেখা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, গোটা দশক জুড়েই বাংলাদেশের ভোগ প্রবৃদ্ধি দরিদ্রদের অনুকূলে ছিল। এ সময়ে দেশের দরিদ্রতম পার্সেন্টাইল হতে প্রায় ৭০তম পার্সেন্টাইল পর্যন্ত সকল পরিবারের ভোগ প্রবৃদ্ধি দরিদ্রবান্ধব।

চিত্র ১৩ ঃ প্রবৃদ্ধির আপতন রেখা

চিত্র ঃ ১৩.১ ২০০০-০৫ চিত্র ঃ ১৩.২ ২০০৫-১০ চিত্র ঃ ১৩.৩ ২০০০-১০

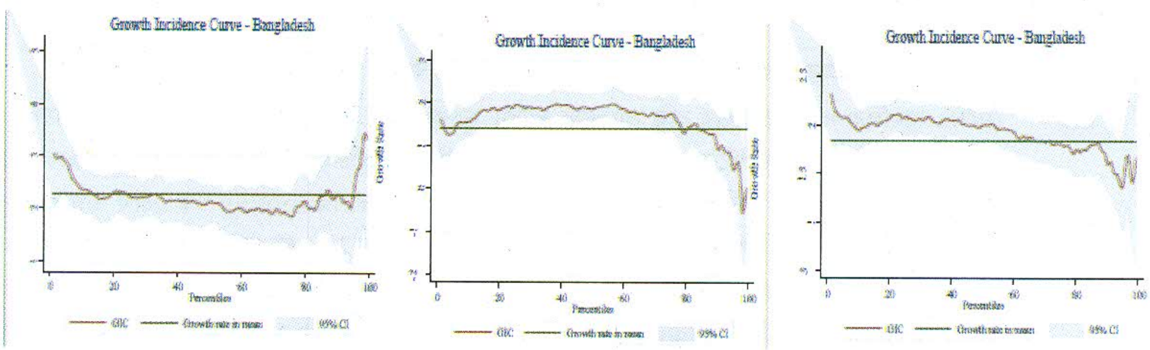

উৎস: বিশ্ব ব্যাংক

৯.৭ একটি দেশের কোন নির্দিষ্ট দুটি সময়কালে হেডকাউন্ট দারিদ্রসূচকের যে পরিবর্তন হয় তার জন্য দুটি বিষয় ভূমিকা পালন করে। এর একটি হলো ভোগ ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি যাকে দারিদ্র পরিবর্তনের Growth Component বলা হয় এবং অপরটি হলো ভোগ বন্টন কাঠামোর[12] পরিবর্তন যাকে দারিদ্র পরিবর্তনের Redistribution Component বলা হয়। ডাট এবং রাভালিয়ন (১৯৯২) দারিদ্র পরিবর্তনের এই দুটি উপাদানের অবদানকে আলাদা করার কৌশল উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিবর্তনের Growth Component আলাদা করার জন্য দুটি সময় কালের মধ্যে দেশের ভোগ-বন্টন কাঠামোকে অপরিবর্তিত (লরেঞ্জ রেখা) রেখে কেবল গড় ভোগ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে দারিদ্র-সূচকের যে পরিবর্তন হয় তা নির্ণয় করা হয়। অনুরূপভাবে দারিদ্র পরিবর্তনের Redistribution Component পৃথক করার জন্য দুটি সময়কালের মধ্যে দেশের গড় ভোগ ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে কেবল ভোগ-বন্টন কাঠামো পরিবর্তনের কারণে দারিদ্র সূচকের যে পরিবর্তন হয় তা নির্ণয় করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক সম্প্রতি ডাট এবং রাভালিয়ন (১৯৯২) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০০০-০৫, ২০০৫-১০ এবং ২০০০-১০ সময়কালের বাংলাদেশের হেডকাউন্ট দারিদ্রসূচকের পরিবর্তনকে Growth এবং Redistribution উপাদানে বিভক্ত করেছে যা নিম্নে টেবিলসহ চিত্রে (চিত্র-১৪) প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্র ও ছকে

[12] ভোগ বন্টন কাঠামোর পরিবর্তনের অর্থ হলো দুটি সময়কালের মধ্যে দেশের লরেঞ্জ রেখার স্থানান্তর। লরেঞ্জ রেখার ধারণা ৬.৩ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, ২০০০-০৫ সময়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের হেডকাউন্ট দারিদ্র পরিবর্তন হয়েছে-০.০৯ পয়েন্ট যেখানে প্রবৃদ্ধির অবদান -০.১০ এবং পুনর্বন্টনের অবদান ০.০১। এর অর্থ হলো বর্ণিত সময়কালে যদি দেশের ভোগ বন্টন কাঠামোর পরিবর্তন না হতো তাহলের দেশের প্রবৃদ্ধি -০.১০ পয়েন্ট দারিদ্র পরিবর্তন করত অর্থাৎ ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশের পরিবর্তে ৩৮.৯ শতাংশ লোক দরিদ্র থাকতো। অপরদিকে একই সময়কালে দেশের গড় ভোগ অপরিবর্তিত থেকে যদি কেবল ভোগ বন্টন কাঠামোর পরিবর্তন হতো তাহলে দারিদ্রের হার ০.০১ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেত। অর্থাৎ ২০০৫ সালে দেশের দারিদ্র হার দাড়াতো ৪৯.৯ শতাংশ। বাস্তবিক দারিদ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রবৃদ্ধি এবং পুনর্বন্টন প্রক্রিয়া একত্রে ক্রিয়াশীল সেহেতু প্রবৃদ্ধির অনুকূল প্রভাবের একটা অংশ অসমতার (পুনর্বন্টনের) প্রতিকূল প্রভাবের দ্বারা অপসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রভাব শক্তিশালী থাকায় চূড়ান্ত পর্যায়ে দারিদ্র কমেছে। একইভাবে ২০০০-০৫ সময়ে পল্লী ও শহর উভয় অঞ্চলেই প্রবৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাসে অনুকূল ভূমিকা রাখলেও পুনর্বন্টন প্রক্রিয়া দারিদ্র বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং এই বিশ্লেষণ মোতাবেক ২০০০-০৫ সময়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দরিদ্রবান্ধব ছিল না।

চিত্র ১৪ ঃ দারিদ্র পরিবর্তনের প্রবৃদ্ধি এবং পুনর্বন্টনের অবদান

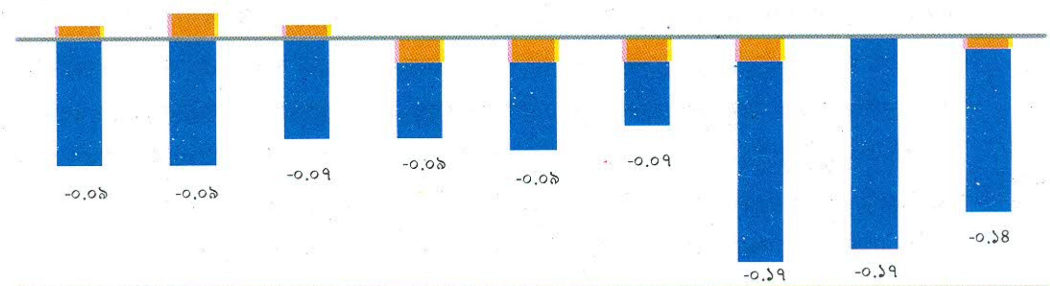

	জাতীয় (২০০০-০৫)	পল্লী (২০০০-০৫)	শহর (২০০০-০৫)	জাতীয় (২০০৫-১০)	পল্লী (২০০৫-১০)	শহর (২০০৫-১০)	জাতীয় (২০০০-১০)	পল্লী (২০০০-১০)	শহর (২০০০-১০)
প্রবৃদ্ধি	-০.১০	-০.১০	-০.০৮	-০.০৬	-০.০৭	-০.০৫	-০.১৬	-০.১৭	-০.১৩
পুনর্বন্টন	০.০১	০.০২	০.০১	-০.০২	-০.০২	-০.০২	-০.০২	০	-০.০১

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক

৯.৮ ২০০৫-১০ সময়ে দেখা যাচ্ছে দারিদ্র পরিবর্তনের প্রবৃদ্ধি এবং পুনর্বন্টন উভয় উপাদানই একে অপরের পরিপূরক হয়ে সকল পর্যায়ে (জাতীয়, পল্লী ও শহর) দারিদ্র হ্রাসে ভূমিকা পালন করেছে। যেমন এই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র পরিবর্তিত হয়েছে -০.০৯ পয়েন্ট যেখানে প্রবৃদ্ধির অবদান -০.০৬ পয়েন্ট এবং পুনর্বন্টনের অবদান -০.০২ পয়েন্ট[১৩]। অর্থাৎ এ সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে সম্পদ পুনর্বন্টিত হয়েছে (ভোগের ক্ষেত্রে অসমতা কমেছে)। ফলে প্রবৃদ্ধির সুফল অদরিদ্রদের তুলনায় দরিদ্ররা অধিক হারে ভোগ করেছে যা দারিদ্র হ্রাসে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে একই সময়ে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র কমেছে -০.০৯ পয়েন্ট যেখানে প্রবৃদ্ধির অবদান -০.০৭ পয়েন্ট এবং পুনর্বন্টনের অবদান -০.০২ পয়েন্ট এবং শহরাঞ্চলে দারিদ্র কমেছে -০.০৭ পয়েন্ট যেখানে প্রবৃদ্ধির অবদান -০.০৫ পয়েন্ট এবং পুনর্বন্টনের অবদান -০.০২ পয়েন্ট। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ২০০৫-১০ সময়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে দরিদ্রবান্ধব ছিল। ২০০০-১০ পুরো সময় একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যায় দারিদ্র পরিবর্তনের উভয় উপাদানই দারিদ্র হ্রাসের অনুকূল ছিল। তবে এই সময়ে পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র হ্রাসে কেবল প্রবৃদ্ধিই এককভাবে অবদান রেখেছে। এ ক্ষেত্রে পুনর্বন্টনের কোন অবদান না থাকলেও তার কোন ক্ষতিকর প্রভাব দারিদ্র হ্রাসের ওপর পড়েনি।

[১৩] অবশিষ্ট -০.০১ পয়েন্ট রেসিডুয়াল।

৯.৯ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্ন্তভূক্তিমূলক হওয়ার পিছনে দেশের সামাজিক গতিশীলতার বৃদ্ধি অনেকটাই ভূমিকা পালন করেছে। কোরাক (২০১২) তার গবেষণায় দেখান, যে সমাজ যত গতিশীল সেই সমাজের অসমতা তত কম। একটি সমাজে সন্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন যদি পিতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর তেমন নির্ভরশীল না হয় তা হলে সমাজ গতিশীল আছে ধরে নেয়া হয়। স্থবির সমাজ ব্যবস্থায় ধনী পরিবারের সন্তানেরা ধনীই থাকে। ফলে এক প্রজন্মের পর অন্য প্রজন্মে সমাজের বিত্ত বন্টনে বৈষম্য বাড়াতে থাকে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি তার কর্মপন্থার মাধ্যমে সকল নাগরিকদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে পারে তাহলে সমাজ আর স্থবির থাকেনা। এরূপ সমাজে প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। সন্তানের মানবিক মূলধন গঠনের জন্য পরিবারসমূহের অর্থ ও সময় ব্যয়ের প্রবণতা, মানবিক মূলধন গঠনের জন্য সরকারের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যয়, গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচে কাঁচা-পাকা রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রোথ সেন্টারগুলোর সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য অবকাঠামোগত ব্যয়, সরকারের সামাজিক খাতে ব্যয় (Social Transfer), সর্বক্ষেত্রে সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণে সরকারি নীতি আদর্শ, শ্রম বাজারের নমনীয়তা, তৈরি পোষাক শিল্পে বিপুল সংখ্যক মহিলাদের কর্মসংস্থান, সরকারি ও বেসরকারি খাতের ক্ষুদ্রঋণ[১৪] কার্যক্রমসহ ব্যাপক জন সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং দেশব্যাপী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে ক্রমগতিশীল করে তুলেছে। আর এই কারণে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বা অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের অনেক দরিদ্র পরিবার হতে বর্তমানে বহুসংখ্যক সফল শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের পদস্থ চাকুরীজীবি, পেশাজীবী সহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল ব্যক্তিবর্গের আত্নপ্রকাশ ঘটেছে। বংশ পরম্পরায় অনুসৃত পারিবারিক পেশা ছেড়ে অসংখ্য মানুষ দেশের ভিতর এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা দেশের বস্তুগত ও মানবিক মূলধন গঠনে ভূমিকা পালন করছে। বস্তুত একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-জাতি ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত হওয়ায় বাংলাদেশের আয় বন্টনের বৈষম্য সংযত হয়েছে।

৯.১০ বিষয়টিকে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণের জন্য সামাজিক গতিশীলতার সংখ্যাগত পরিমাপ জানা আবশ্যক। এর জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতি হলো আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা (Intergenetational Elasticity in Earning) পরিমাপ করা যেখানে পূর্ববর্তী প্রজন্মের আয়ের শতকরা পরিবর্তন সাপেক্ষে পরবর্তী প্রজন্মের আয়ের শতকরা পরিবর্তন হিসাব করা হয়। এই স্থিতিস্থাপকতার মান সর্বোচ্চ ১ এর সমান হতে পারে যার অর্থ গরীব (ধনী) পরিবারের সন্তানেরা গরীবই (ধনী) থাকবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা শূন্য। আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যত কম সমাজ তত গতিশীল। বাংলাদেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা এবং তাদের অসমতাবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ভিত্তিতে বাংলাদেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে একটি পরোক্ষ অনুমান করার প্রয়াস এখানে নেয়া হয়েছে (সংযোজনী ২ দ্রষ্টব্য)। সংযোজনী ২ এর বিশ্লেষণ মোতাবেক বাংলাদেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার অনুমিত মান প্রায় ৩৫ শতাংশের মত। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যার সম্ভবত ৩৫ শতাংশের আয় তাদের পূর্বপুরুষদের আয়ের সাথে

[১৪] ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মহিলাদের ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

সম্পর্কিত। অবশিষ্ট প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ পারিবারিক আনুকূল্য ব্যতিরেকেই উত্তরণের পথে এগিয়েছে মর্মে অনুমান করা যায় যা বাংলাদেশের সামাজিক গতিশীলতা সম্পর্কে উচ্চ ধারনা দেয়। বস্তুত স্বাধীনতার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সমাজ জীবনের যে দৃশ্যমান পরিবর্তন চোখে পড়ে (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য) তার সব কিছুই এই ধারনাকে সমর্থন করে।

৯.১১ পর্যাপ্ত পুনর্বন্টনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্র শ্রেণীও ভোগ করছে। এ কারণে, দেশে ভোগ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমতা বিরাজ করছে। স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এবং আয় বন্টনের অসমতা যুগপৎভাবে বাড়লেও ভোগ বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা তুলানামূলকভাবে কম ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৮৪ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভোগ গিনি সূচক একটা অসরলরৈখিক (Non-linear) পথে বেড়ে ১৯৯৬ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত স্থিত অবস্থায় (Plateau) ছিল। পরবর্তীতে ২০০০ সাল হতে ২০১০ সালের মধ্যে তা আবার হ্রাস পেয়েছে (চিত্র-১০ দ্রষ্টব্য)। ২০০৫-২০১০ সময়ে ভোগ গিনি সূচক ৩.৪ শতাংশ এবং আয় গিনি সূচক ১.৯ শতাংশ হারে কমেছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর হতে অব্যাহতভাবে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে যে অসমতা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ২০০৫ সাল হতে তাতে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ আয় বন্টন বর্তমানে সুষম হচ্ছে। তাছাড়া সমাজের মোট আয়ে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভোগের অংশ হ্রাস পায়নি। এ থেকেই অনুমান করা যায় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্ররাও ভোগ করেছে এবং ভোগ বন্টনের এই তুলনামূলক সমতা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিকে করেছে অধিকতর দরিদ্রবান্ধব।

৯.১২ ২০১০ সালের আয় শ্রেণীভিত্তিক ভোগ কাঠামো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দেশের ৭৯ শতাংশ পরিবারের ভোগব্যয় তাদের আয়ের তুলনায় বেশি (চিত্র ১৫.১)। এর একাধিক কারণ থাকতে পারে। তবে সরকারি পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বাবদ এবং বেসরকারি পর্যায়ে দেশি বিদেশি রেমিটেন্স, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি স্থানান্তর ব্যয়ের ভূমিকা যে এখানে অনেক বেশি তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিত্র ১৫.২ এর স্বপক্ষে যুক্তি দেয় যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়ে ব্যক্তিগত স্থানান্তরের অংশ দক্ষিণ এশিয়া তথা সারা বিশ্ব এবং প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় বেশি।

চিত্র ১৫ঃ পরিবার প্রতি মাসিক আয় ও ভোগ এবং বেসরকারি স্থানান্তর ব্যয়

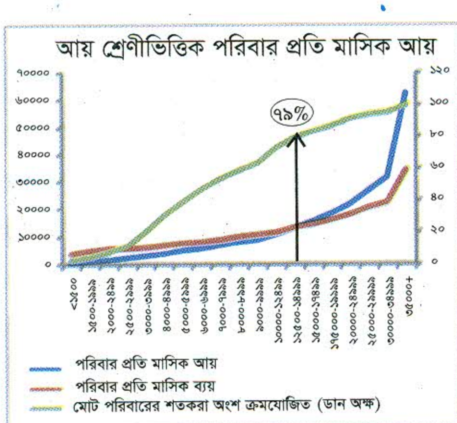

উৎস: বিবিএস

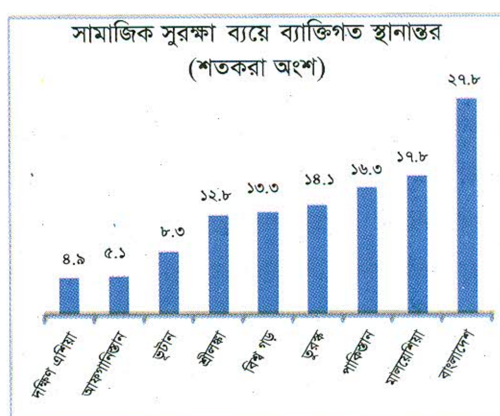

উৎস: The Atlas of Social Protection, World Bank

৯.১৩ বাংলাদেশের হেডকাউন্ট দারিদ্র, দারিদ্রের গভীরতা এবং দারিদ্রের তীব্রতা যেহেতু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আয় ও ভোগ বন্টন কাঠামোর ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, সেহেতু দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং আয় ও ভোগ বন্টনের নিয়ামক উপাদানগুলোই দারিদ্র হ্রাসের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রধানতম নির্ণায়ক হলো উৎপাদনের উপকরণসমূহের উৎপাদনশীলতার (Productivity) বৃদ্ধি। উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে তাহলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরীও বাড়ে যা তাকে দারিদ্রমুক্ত করে। শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির পিছনে বিদ্যমান প্রযুক্তি, শ্রমিক প্রতি মূলধনের পরিমাণ (Capital-labour Ratio), শ্রমিকের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি উপাদান ক্রিয়াশীল।

৯.১৪ অধুনা বহুল আলোচিত এন্ডোজেনাস প্রবৃদ্ধির (Endogenous Growth Theory) তত্ত্বানুসারে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ এবং কাঠামো উভয়ই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও একটা নির্দিষ্ট পর্যায় (জিডিপি'র অংশ হিসেবে) পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে সরকারি ব্যয় বাড়লে যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ে তা নিয়ে প্রায় সবাই একমত। আরেকটা বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে তা হলো সরকারের সামগ্রিক ব্যয়ের মধ্যে কয়েক ধরনের ব্যয় যেমনঃ মূলধন ব্যয় এবং মানব পুঁজি গঠন (Human Capital Formation) যথাঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বাবদ ব্যয় সরাসরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। এ ক্ষেত্রে যুক্তি হলো সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে সৃজিত গণদ্রব্য (Public Goods) যেমন উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্যাস, পানি, বিদ্যুত ব্যবস্থা ইত্যাদি অথবা ব্যক্তির সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকার (Rights to Keep Private Property) নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনের উপকরণ (Factor of Production) যথা শ্রম এবং মূলধনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। সরকারের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতের ব্যয় মানব পুঁজি গঠনের মাধ্যমে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় যা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীল সরকারি ব্যয়ের কিছুটা ধনাত্মক বাহ্যিক (Positive Externalities) প্রভাব থাকে যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শ্রম এবং মূলধনের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন প্রবণতা প্রতিহতকরণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

৯.১৫ রবার্ট ব্যারো (১৯৯৮) উল্লেখ করেন যে, জিডিপির অনুপাতে সরকারের উৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনীতির সঞ্চয় এবং প্রবৃদ্ধি উভয়ই বাড়ে। এরূপ ব্যয় বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে সঞ্চয় এবং প্রবৃদ্ধি এক সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে পরবর্তীতে কমতে থাকে। অর্থাৎ জিডিপির অনুপাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক উল্টো-ইউ অক্ষরের মত (Inverted-U Shaped) হয়। এ ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, যে সব দেশের সরকারের ব্যয়ের আকার কাম্য অবস্থার চেয়ে ছোট সে সব দেশের সরকারি ব্যয় ও প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক সরলরৈখিক ভাবে ধনাত্মক হবে। বাংলাদেশে ১৯৭৬ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত জিডিপির অনুপাতে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল গড়ে শতকরা ১৪.১৬ শতাংশ। একই সময়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গড়ে তাদের জিডিপি'র ২৪.৫৩ শতাংশ সরকারি পর্যায়ে ব্যয় করতো। তাহলে দেখা যাচ্ছে সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় ব্যয়ের বিচারে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয়ের আকার খুব ছোট ছিল। কাজেই ব্যারোর তত্ত্বানুসারে বিগত ১ দশক জুড়ে বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত এই ছোট আকারের সরকারি খাত যখন প্রতিবছর সামান্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন তা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও উদ্দীপ্ত করেছে। আশা করা যায় জিডিপির অনুপাতে সরকারের ব্যয় কাম্য পর্যায়ে না পৌছানো পর্যন্ত এই ধারা স্বাভাবিকভাবেই অব্যাহত থাকবে[১৫]।

[১৫] লেখকের হিসেবমতে ২০০০-১০ সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চকারী (growth maximizing) সরকারি খাতের আকার ছিল গড়ে জিডিপির শতকরা ২৬.৭৯ ভাগ।

৯.১৬ চিত্র ১৬ এ জিডিপির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয়ের সাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। সরকারি ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ব্যয়ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছে।

চিত্র ১৬ ঃ সরকারি ব্যয় (জিডিপির অংশ) ও মাথাপিছু আয় প্রবৃদ্ধি (১৯৭৬-২০১০)

১৬.১ মোট সরকারি ব্যয় ১৬.২ শিক্ষা খাতের ব্যয় ১৬.৩ স্বাস্থ্য খাতের ব্যয়

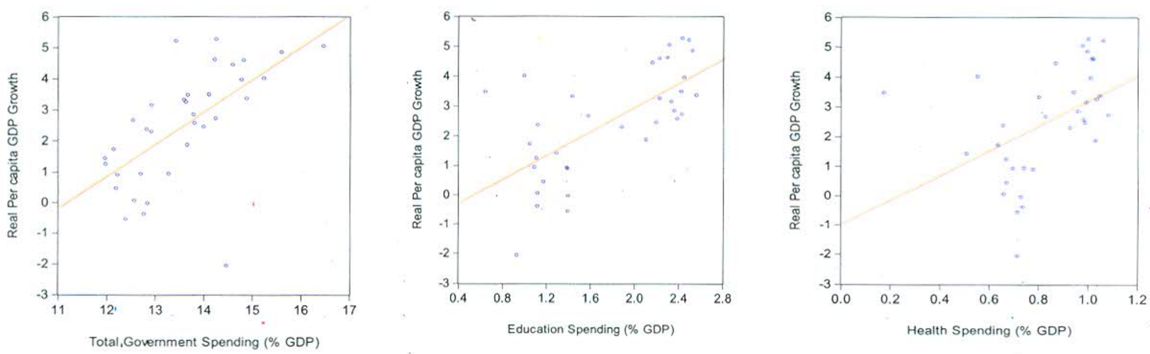

সরকারি ব্যয় একদিকে যেমন সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদার দিক থেকে সমাজের আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছে অপরদিকে তেমনি উৎপাদনের উপকরণসমূহের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে সরবরাহের দিক থেকেও উৎপাদন বাড়িয়েছে। সারণি ১৫ তে ১৯৭৬ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের নির্বাচিত কয়েকটি সূচকের পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যাপক ভূমিকা ব্যতিরেকে এরূপ সফলতা অর্জন দুরূহ হত।

৯.১৭ ইতোমধ্যে সম্পাদিত বহু গবেষণায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সাথে প্রবৃদ্ধির ধনাত্মক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। যেমন রাম (১৯৮৬) ১১৫টি দেশের ১৯৬০-৮০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সাথে প্রবৃদ্ধির ধনাত্মক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। এছাড়া ৭৫টি দেশের ১৯৬০-৮০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ব্যারো (১৯৯০), মেক্সিকোর ১৯৫০-৯০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে নাজমি রামিরেজ (১৯৯৭), ওইসিডিভুক্ত ২৩টি দেশের ১৯৭১-৮৮ সালের সালের তথ্যের ভিত্তিতে ক্যাশিন (১৯৯৫) এবং ওইসিডিভুক্ত ২১টি দেশের ১৯৯৫-৯৬ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ডেলা ফুয়েন্টে (১৯৯৭) সরকারি বিনিয়োগ ব্যয়ের সাথে প্রবৃদ্ধির ধনাত্মক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। এমনকি সরকারি ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির সাথেও আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন কতিপয় গবেষক। এদের মধ্যে রোমার (১৯৮৯) এবং ডেভারজন ও অন্যান্য (১৯৯৬) এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। অনেক গবেষক সরকারের শিক্ষা খাতের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে প্রবৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে পান। এদের মধ্যে ব্যারো ও সালা-ই মার্টিন (১৯৯৫), মিলার রুশেক (১৯৯৭) এবং ব্লিনি ও অন্যান্য(২০০১) এর গবেষণা প্রণিধানযোগ্য। অবশ্য শেষোক্ত গবেষক সরকারের শিক্ষা ব্যয়ের সাথে প্রবৃদ্ধির সুসম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন।

সারণি ১৫ ঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের নির্বাচিত সূচকসমূহের পরিবর্তন					
সূচকসমূহ	১৯৭৬	১৯৯২	২০০০	২০১০	২০১২
নির্ভরশীলতার অনুপাত (কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর শতকরা হার)	৯২.৬৫	৮১.৯৪	৬৯.৫৯	৫৬.৯২	৫৪.৫৩
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা)	৪৫.০৩	৩৩.৩৩	২৭.০৩	২০.৯৩	২০.৩১
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা)	১৭.০৫	৯.৪০	৭.২৪	৫.৯০	৫.৭৪
খাদ্য ঘাটতির গভীরতা (জন প্রতি দৈনিক কিলোক্যালরি)	..	২৩০.০০	১৪৮.০০	১১১.০০	১১৪.০০
ফার্টিলিটি রেট, মোট (মহিলা প্রতি জন্ম দান)	৬.৭৬	৪.২০	৩.১২	২.২৮	২.২১
টিকাদান (ডিপিটি) (১২-১৩ মাস বয়সী শিশুর শতকরা হার)	..	৬৬.০০	৮২.০০	৯৫.০০	৯৬.০০
উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তি (জনসংখ্যার শতকরা হার)	..	..	৪৪.৫৩	৫৫.০২	৫৭.০৩
উন্নত পানির প্রাপ্যতা (জনসংখ্যার শতকরা হার)	..	..	৭৫.৯৭	৮৩.৪২	৮৪.৮৪
প্রত্যাশিত জীবনকাল (বছর)	৫০.৪৩	৬১.০৬	৬৫.৩২	৬৯.৪৯	৭০.২৯
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবন্ত জন্ম হতে)	১৪৩.৫০	৯২.০০	৬৪.২০	৩৭.৫০	৩৩.১০
৫ বছরের নীচের শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবন্ত জন্ম হতে)	২১৪.৪০	১৩১.৭০	৮৭.৭০	৪৭.২০	৪০.৯০
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা বার্ষিক)	২.৩০	২.২৫	১.৮৪	১.০৮	১.১৯
শিক্ষার হার, বয়স্ক (১৫+ জনসংখ্যার শতকরা হার)	২৯.২৩	৩৫.৩২	৪৭.৪৯	৫৭.৭৩	
নারী শিক্ষার হার, বয়স্ক (১৫+ জনসংখ্যার শতকরা হার)*	১৭.৯৭	২৫.৮৪	৪০.৮২	৫৩.৪১	

* যথাক্রমে ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালের তথ্য, উৎসঃ বিশ্ব ব্যাংক

৯.১৮ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে বিদ্যমান মূলধন-শ্রম অনুপাত (Capital-labour Ratio) পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সুফল মূলতঃ-শ্রম উপকরণের অনুকূলে গেছে। চিত্র ১৭(১) এ দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে জনগণের মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে অর্থাৎ দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির অন্যতম নির্ধারক হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস। দেশের মূলধন মজুদের (Capital Stock) প্রবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম থাকলে মাথাপিছু মূলধন বৃদ্ধি পায় যা শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মজুরী বাড়ায়। এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৯২ হতে ২০১০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.৫ শতাংশ এবং ১.১২ শতাংশ অথচ এই একই সময়ে দেশের স্থায়ী মূলধন গঠনের প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে বার্ষিক প্রায় ৭.৯ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় মূলধন গঠনের প্রবৃদ্ধি বেশি থাকার কারণে কাল পরিক্রমায় দেশের মূলধন মজুদের পরিমাণ জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে ১৯৯১ সালের ১৬.৯ হতে বেড়ে ২০১০ সালে ২৪.৪ এ দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই অর্থনীতির প্রত্যেক খাতেই প্রকৃত মজুরী বেড়েছে। বিশেষ করে শিল্পখাতের প্রকৃত মজুরী উল্লিখিত সময়ে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে (চিত্র ১৭(৩) দ্রষ্টব্য)।

৯.১৯ বিশ্ব ব্যাংকের মতেও দারিদ্র বিমোচনের জন্য সবচেয়ে অধিক অবদান রেখেছে শ্রমিকের আয়। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রেমিটেন্সও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা পালন করেছে। যেসব পরিবারে প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য বেশি সে সব পরিবারের মাথাপিছু আয় দ্রুত বেড়েছে এবং তাদের দারিদ্রের হার, তীব্রতা ও গভীরতা কমেছে। শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মূলতঃ খামার আয় (Farm income) বৃদ্ধির কারণে। পরিবারের আয় এবং ভোগের পরিমাণ পরিবারের

সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, লিংগ, পেশা, কর্মস্থল এবং শ্রমের ভৌগলিক বন্টন কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। বিশ্ব ব্যাংক সম্প্রতি পরিবারসমূহের আয় এবং ভোগ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপাদানগুলোর অবদান পরিমাপ করেছে। তাদের বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক endowment-সমূহের উচ্চতর রিটার্নই শ্রম আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছে। যার অর্থ শ্রমের আপেক্ষিক মূল্য এবং উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিই দারিদ্র হ্রাস ত্বরান্বিত হওয়ার অন্যতম কারণ। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে দেখা যায়, দারিদ্র হ্রাসের ৬৪ শতাংশই সংঘটিত হয়েছে খামার এবং খামার বহির্ভূত endowment সমূহের রিটার্ন বৃদ্ধির কারণে যার সিংহভাগই ঘটেছে পল্লী অঞ্চলে। দেশের দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি কৃষি সংশ্লিষ্ট পল্লী অঞ্চলে গভীরতর ছিল বিধায় কৃষি খামারের আয় বৃদ্ধি ২০০০-১০ সময়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দারিদ্র হ্রাস করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায়, ২০০০-২০১০ সময়ের প্রথমার্ধে নন-ফার্ম খাতে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাসে ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া এ সময়ে দেশের শ্রম কাঠামোর তিন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা দারিদ্র হ্রাসে সহায়ক ছিল। পরিবর্তনগুলো হল- কৃষি খাত হতে শিল্প ও সেবা খাতে অধিকতর শ্রম স্থানান্তর, দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিক ও আত্মকর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল শ্রম শক্তির একটি বড় অংশ বেতনভূক্ত চাকুরীতে স্থানান্তর, শ্রম-শক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি। ২০০০-১০ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষি খামার খাতে দারিদ্র কমেছে সবচেয়ে বেশি তবে এই দারিদ্র হ্রাস শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতি বা পেশা পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এটি ঘটেছে কেবল পল্লী অঞ্চলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধির কারণে।

৯.২০ শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধিই কেবল সামগ্রিকভাবে শ্রমশক্তির দারিদ্র হ্রাসের জন্য যথেষ্ট নয় যদি না নিয়োগের (Employment) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আশার কথা হলো ২০০২-০৩ হতে ২০১০ সময়ে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার শতকরা ৪.৩-৪.৫[১৬] ভাগের মধ্যে সীমিত ছিল। একদিকে মজুরী বৃদ্ধি অন্যদিকে বেকারত্বের হারের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন না হওয়া এই দু'য়ে মিলে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির জন্য সমৃদ্ধির এক অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে যা কালক্রমে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্রের গভীরতা এবং তীব্রতাও কমিয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

চিত্র ১৭ ঃ মাথাপিছু মূলধন গঠন প্রক্রিয়া এবং প্রকৃত মজুরী

চিত্র ঃ ১৭.১ মাথাপিছু জিডিপি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

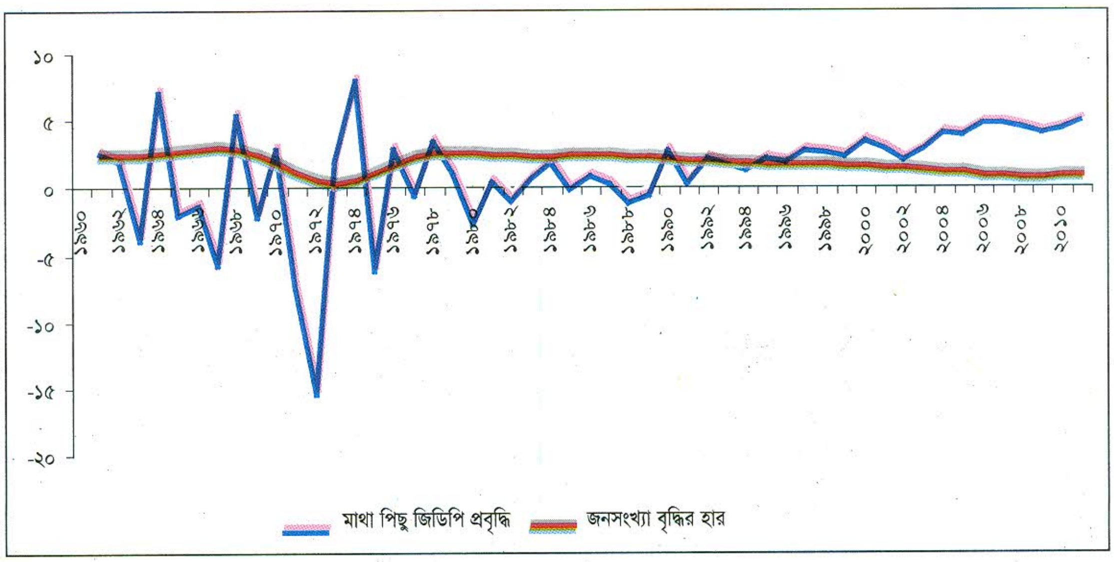

[১৬] Labour Force Survey, 2010, BBS

চিত্র ঃ ১৭.২ স্থায়ী মূলধন গঠন এবং প্রবাস আয়

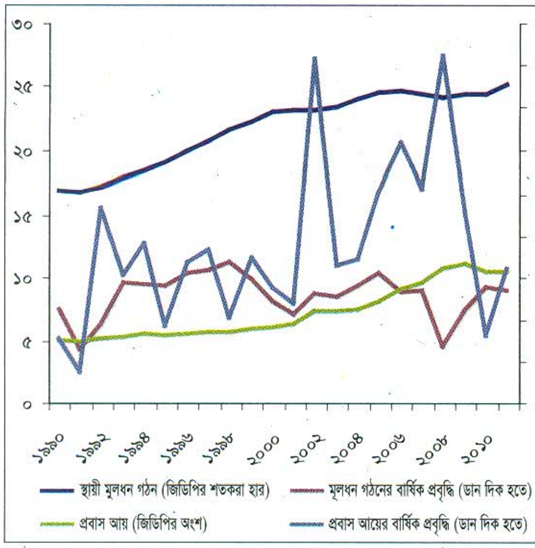

চিত্র ঃ ১৭.৩ প্রকৃত মজুরী সূচক (১৯৬৯-৭০=১০০)

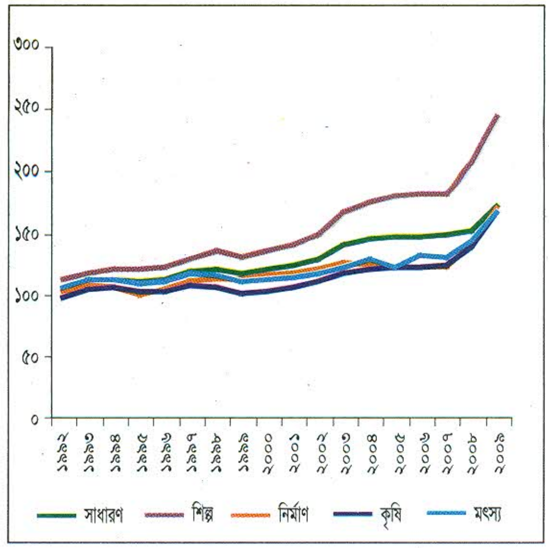

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক ও বিবিএস

৯.২১ দেশের মূলধন গঠনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রবাস আয়ও ভূমিকা পালন করেছে। চিত্র ১৭(২) এ দেখা যাচ্ছে জিডিপি'র অংশ হিসেবে প্রবাস আয় এবং দেশের মূলধন গঠনের পরিমাণ ১৯৯০ সাল হতেই সমান্তরালভাবে বেড়েছে। তবে দেশের মূলধন গঠন এবং প্রবাস আয় প্রবৃদ্ধি হারের পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন জোরালো নয়। সম্ভবত দেশে আগত প্রবাস আয় কিছুটা সময় ব্যবধানে (Time Lag) মূলধন গঠনে ভূমিকা পালন করে। তবে প্রবাস আয় ভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমেও দারিদ্র হ্রাস করেছে। অর্থনীতিতে প্রবাস আয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং তার ভোগ গুণক (Consumption Multiplier) প্রভাব দেশের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা দারিদ্র হ্রাসের অনুকূল ছিল।

৯.২২ ১৯৯০ সাল হতে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উৎপাদন কাঠামো এবং মোট আয়ে খাতভিত্তিক অবদানের সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। মোট উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে কমে শিল্প ও সেবা খাতের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে বেতন-ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। চিত্র ১৮(২) এ দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ সালে দেশের মোট উৎপাদনে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩০.২৫, ২১.৪৭ এবং ৪৮.২৮ ভাগ যা ২০১০ সালে যথাক্রমে শতকরা ১৮.৫৯, ২৮.৪৬ এবং ৫২.৯৫ ভাগে পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের পরিবারসমূহের উৎসভিত্তিক আয় কাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবারসমূহের মোট আয়ে কৃষিখাতের অংশ ১৯৯১-৯২ সালের ৩৩.৪ শতাংশ হতে কমে ২০১০ সালে ২০.৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিপরীতক্রমে পেশাগত মজুরি একই সময়ের মধ্যে ২৪.৩ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১০ সালে ৩৫.৬০ শতাংশ হয়েছে। সেবা খাতের প্রসারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎস থেকে আয়ের অংশ ১৯৯১-৯২ সালের ১৪.৮০ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১০ সালে ১৯.১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কৃষি উৎসের চেয়ে শিল্প এবং সেবা খাত উৎস থেকে সমাজের মোট আয় ক্রমশই পুঞ্জিভূত হওয়ার কারণে পরিবারসমূহের মাসিক আয় প্রবাহ পূর্বের তুলনায় অনেকটাই নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থিতিশীল হয়েছে যা দারিদ্রের হ্রাসের অন্যতম চালিকা শক্তি।

চিত্র ১৮ ঃ উৎপাদন ও আয় কাঠামোর পরিবর্তন

চিত্র ১৮.১

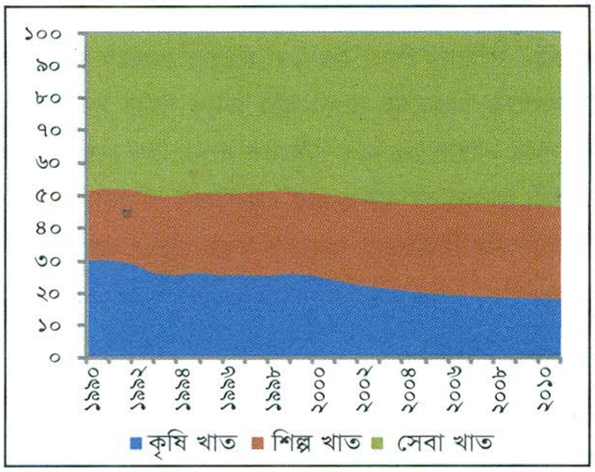

চিত্র ১৮.২

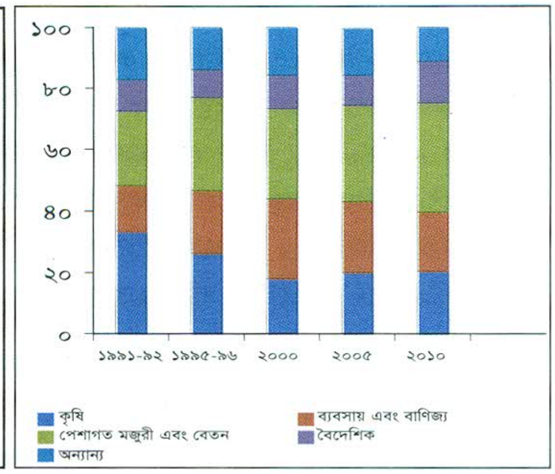

উৎস ঃ বিবিএস

৯.২৩ দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য আবাসগৃহ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং নগরায়নের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে দেশের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৯৪.৬ লাখ হেক্টর থেকে কমে ২০১১ সালে ৭৬.২৮ লাখ হেক্টর দাঁড়ালেও দেশের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কমেনি বরং বেড়েছে। বাংলাদেশের শস্যের উপাদান ১৯৯০ সালের ২৭.৭৫ মিলিয়ন মে. টন হতে বেড়ে ২০১১ সালে ৫২.৬৩ মিলিয়ন মে. টনে দাঁড়িয়েছে (চিত্র ১৯)। বিশ্ব ব্যাংকের মতে ২০০০-১০ সময়ে কৃষি খাত কিছুটা সংকুচিত হলেও, এই সময়ের শেষটা কৃষি খাতে আয় বৃদ্ধিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। মোট কর্মসংস্থানে কৃষি খাতের অবদান ২০০০-০৫ সময়ে ৫১ থেকে ৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে তথাপি ২০০০-০৫ সময়ে কৃষি খাত হতে শ্রমের আয় বার্ষিক ১.৭ শতাংশ এবং ২০০৫-১০ সময়ে বার্ষিক ৯.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। এ থেকে বলা যায় কৃষি খাত দারিদ্র বিমোচনে তার বিরাট ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে কৃষি উৎপাদনে একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধির পিছনে বর্তমান সরকারের কৃষিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রণোদনা প্রদান ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সরকার উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, স্বল্পমূল্যে এবং সহজলভ্য উপায়ে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে যা কৃষি খাতে বিদ্যমান শ্রম শক্তির আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া কৃষিখাতে ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে বিবেচনা করা যায়।

চিত্র ১৯ ঃ কৃষি জমি এবং কৃষির উৎপাদন

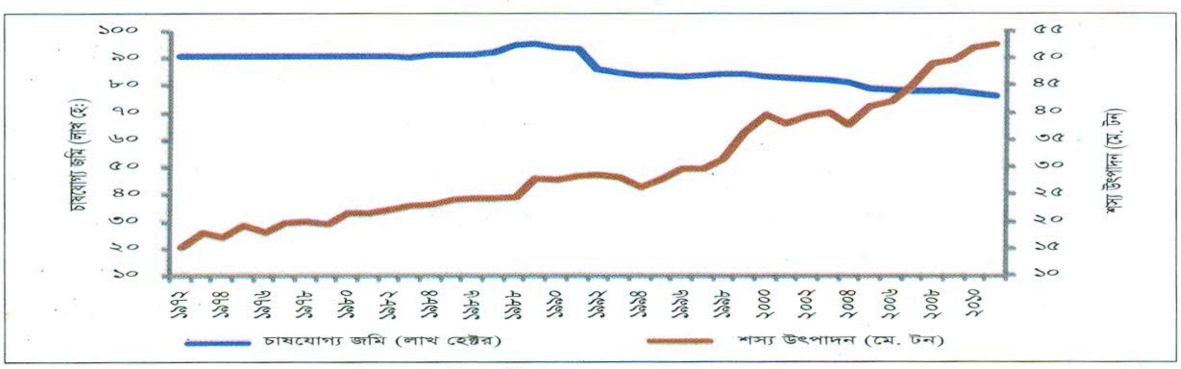

উৎসঃ বিশ্ব ব্যাংক

৯.২৪ কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো এমন অনুকূলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা দারিদ্র হ্রাসের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের নির্ভরশীলতার হার মোট শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ৯২.৮৯ শতাংশ হতে কমে ২০১২ সালে ৫৪.৫৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ১৯৭২ সালে ছিল ৪৬.৮৭ বছর যা ২০১২ সালে ৭০.২৯ বছরে উন্নীত হয়েছে। অনুরূপভাবে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৫-৬৪

বছর বয়সীদের অনুপাত ১৯৭২ সালে ছিল শতকরা ৫১.৮৪ ভাগ যা ২০১২ সালে ৬৪.৭১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭২ সালে পল্লী অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৯১.৫১ ভাগ বাস করতো যা ২০১২ সালে ৭১.১১ ভাগে নেমে এসেছে (চিত্র ২০)। পরিবারের আকার ছোট হয়েছে। নারীদের শিক্ষা হার এবং নিয়োগ বেড়েছে। বিশেষ করে চলতি দশকে ১৫ বছরের অধিক বয়সী নারী শ্রমিকদের নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি চোখে পড়ার মত। Labour Force Survey, 2010 মোতাবেক ২০০২-০৩ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯.৮ মিলিয়ন যা ২০১০ সালে বেড়ে ১৬.২ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। নারী বেকারত্বের হার ২০০৫-০৬ সালের ৭ শতাংশ হতে কমে ২০১০ সালে ৫.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এসব উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় সমাজের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ২০ ঃ ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন

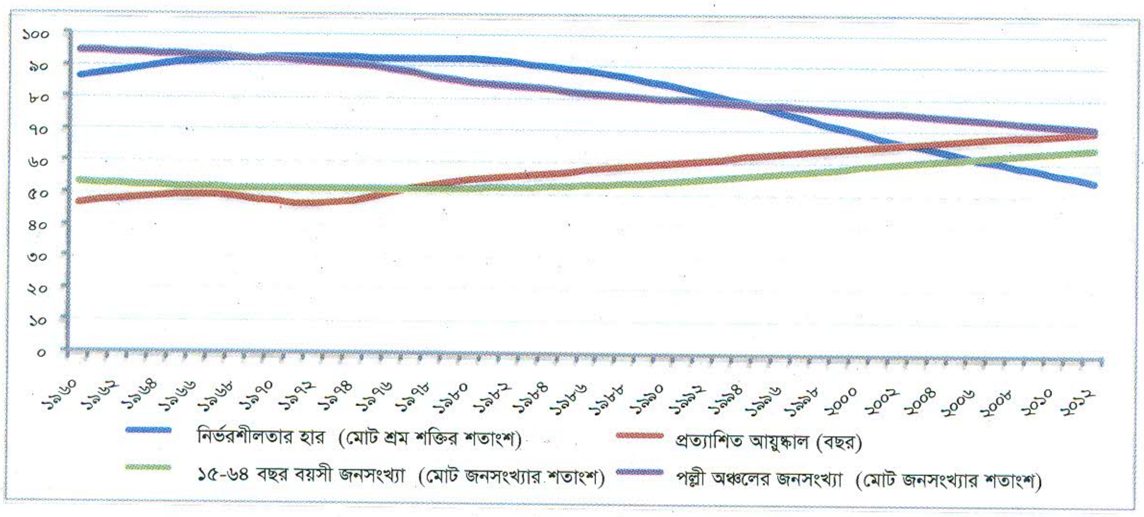

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক

৯.২৫ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি অব্যাহতভাবে চালু থাকায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশিত ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা পেয়েছে। কাবিখা কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের সরবরাহ স্থিতিশীল রেখেছে। এ কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়লেও তা প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায়নি। খাদ্য পণ্যের প্রত্যাশিত মূল্য এবং প্রকৃতমূল্য (Anticipated and Actual Inflation) সমান্তরালভাবে বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের আর্থিক মজুরি খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় রেখে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমেনি। কাজের বিনিময়ে খাদ্য সরবরাহ না করে অর্থ সরবরাহ করলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে খাদ্য যোগানের বিষয়টি সম্পূর্ণ বাজার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে চলে যেত যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন খাদ্য সরবরাহকে ঝুঁকিগ্রস্ত করে তুলত। এ থেকে অনুমান করা যায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি কেবল প্রত্যক্ষভাবেই দারিদ্র হ্রাস করেনি বরং খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে এর একটি পরোক্ষ ভূমিকাও রেখেছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম একই সাথে একদিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, ভৌত অবকাঠামো খাত উন্নয়নে ও সংস্কারে যথেষ্ট অবদান রাখে। তবে সময় পরিবর্তন সাপেক্ষে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও গ্রামীণ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। এছাড়া এই কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অপচয় স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ কার্যক্রমেও পরিবর্তন অপরিহার্য। অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ বহাল রাখার স্বার্থে খাদ্য ভাউচার প্রবর্তনের মাধ্যমে কাবিখা বা বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা ইতোমধ্যে করা হচ্ছে।

১০.০ ভবিষ্যৎ গতিধারা

১০.১ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার যদি বর্তমান ধারায় অব্যাহত থাকে এবং দেশে যদি বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটে তাহলে দেশের দারিদ্রের হার বিদ্যমান ধারায় কমবে। নিম্নের সারণি ১৬ তে একটি প্রক্ষেপণ দেখানো হলো[১৭] । প্রক্ষেপণ মোতাবেক চলতি বছরে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার ২৪.২ শতাংশে নেমে এসেছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রের এই হার শতকরা ২৯ ভাগে নামিয়ে আনা। তাহলে দেখা যাচ্ছে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাংলাদেশ এই লক্ষ্য অর্জন করেছে। উল্লেখ্য ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র ব্যবধান হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ শতাংশ অথচ ২০১০ সালের মধ্যেই দারিদ্র ব্যবধান ৬.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

সারণি ১৬ ঃ দারিদ্র হ্রাসের প্রক্ষেপণ

সাল	দরিদ্র			চরম দরিদ্র		
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
২০১০	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	১৭.৬০	২১.১০	৭.৬৫
২০১১	২৯.৯	৩৩.৩৯৮	১৯.৮	১৫.৭২	১৮.৯১	৫.৯৯
২০১২	২৮.১	৩১.৪৭৬৯	১৮.৩	১৩.৮৫	১৬.৮৮	৪.২৬
২০১৩	**২৬.২**	**২৯.৫০৭৬**	**১৬.৭**	**১১.৯৩**	**১৪.৭৮**	**২.৪৫**
২০১৪	২৪.৩	২৭.৪৯০১	১৫.২	৯.৯৫	১২.৬০	০.৫৬
২০১৫	২২.৪	২৫.৪২৪৪	১৩.৬	৭.৯২	১০.৩৬	-১.৪১
২০১৬	২০.৫	২৩.৩১০৫	১২.০	৫.৮৩	৮.০৩	-৩.৪৬
২০১৭	১৮.৫	২১.১৪৮৪	১০.৪	৩.৬৮	৫.৬৪	-৫.৫৮
২০১৮	১৬.৫	১৮.৯৩৮১	৮.৮	১.৪৮	৩.১৭	-৭.৭৯
২০১৯	১৪.৪	১৬.৬৭৯৬	৭.২	-০.৭৮	০.৬৩	-১০.০৭
২০২০	১২.৩	১৪.৩৭২৯	৫.৫	-৩.০৯	-১.৯৯	-১২.৪৩
২০২১	১০.২	১২.০১৮	৩.৮	-	-	-
২০২২	৮.১	৯.৬১৪৯	২.১	-	-	-
২০২৩	৫.৯	৭.১৬৩৬	০.৪	-	-	-
২০২৪	৩.৬	৪.৬৬৪১	-	-	-	-
২০২৫	১.৪	২.১১৬৪	-	-	-	-
২০২৬	-০.৯	-০.৪৭৯৫	-	-	-	-
২০২৭	-	-৩.১২৩৬	-	-	-	-

[১৭]Time trend of poverty (polynomials of order 2)

চিত্রঃ ২১ দারিদ্র হার হ্রাসের প্রক্ষেপণ

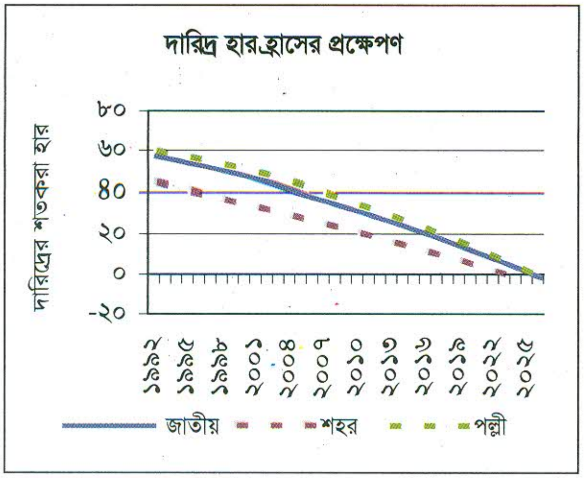

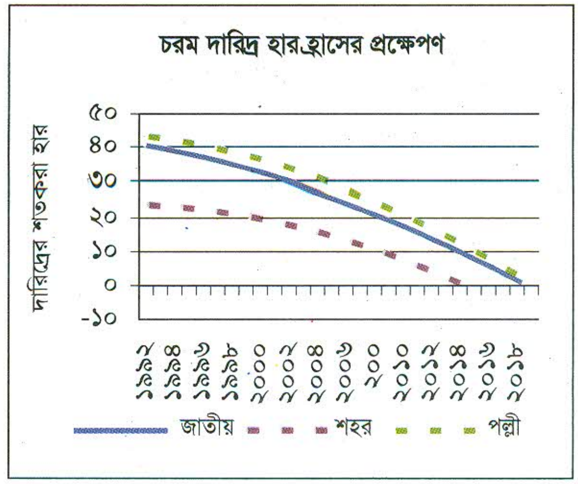

১০.২ সারণি ১৬ তে প্রক্ষেপিত (Projected) তথ্যের আলোকে বলা যায় দারিদ্র হ্রাসের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে চরম দারিদ্রাবস্থা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। ২০১৪ সাল হতে শহরাঞ্চলের চরম দারিদ্র অনেকটাই দূরীভূত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে পল্লী অঞ্চলের চরম দারিদ্র একেবারে নির্মূল হতে বাংলাদেশের ২০১৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। প্রক্ষেপণ মোতাবেক উচ্চ দারিদ্র রেখায় পরিমাপকৃত হেডকাউন্ট দারিদ্র জাতীয় ও পল্লী পর্যায়ে ২০২৫ সালের মধ্যে এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের মধ্যে শূন্যের কোঠায়[১৮] নেমে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

১০.৩ ভবিষ্যতের দারিদ্র অবস্থার হ্রাস-বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি এবং আয় বন্টন কাঠামোর উপর নির্ভর করবে। প্রবৃদ্ধির গতি বাড়লে ১৬ নং সারণিতে বর্ণিত প্রক্ষেপিত সময়ের পূর্বেই বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত হবে মর্মে আশা করা যায়। আয়-বন্টন কাঠামো বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তা অপরিবর্তিত থাকলেও দরিদ্র জনগণ প্রায় নিশ্চিতভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সুফল পাবে বলে প্রতীয়মান হয়।

[১৮] গাণিতিক প্রক্ষেপণ মোতাবেক দারিদ্রের হার শূন্য হলেও বাস্তবে দেশ চূড়ান্ত ভাবে দরিদ্রশুন্য হয় না। কিছু লোক স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্র থাকে আবার কিছু লোক বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে নতুনভাবে দরিদ্র হয়।

১১. ভবিষ্যৎ করণীয়

১১.১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেহেতু দরিদ্রবান্ধব (Pro-poor) সেহেতু দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের জন্য উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের কোন বিকল্প নেই। প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ২৫ ভাগ। এই হার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জিডিপি'র ৩৫ ভাগে উন্নীত করতে হবে। বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে যা দারিদ্র হ্রাসে ভূমিকা পালন করবে। তবে যে সকল খাতে বিনিয়োগ করলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় সে সকল খাতকে সতর্কতার সাথে বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

১১.২ বর্তমানে দেশের জাতীয় সঞ্চয় মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের তুলনায় বেশি। বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুদের হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা আনে। কিন্তু বাংলাদেশে তার লক্ষণ তেমন দেখা যাচ্ছে না। সাধারণত প্রতি একক বিনিয়োগের প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) এবং তার প্রত্যাশিত প্রাপ্তির (Expected Rate of Return) সমতার ভিত্তিতে দেশের ব্যক্তিখাত (Private Sector) বিনিয়োগের পরিমাণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বিশুদ্ধ বাজার ব্যবস্থায় সুদের হার হলো বিনিয়োগের প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost of Investment)। তবে বাজার ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকলে (যেমন- High Interest Spread) অথবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় অ-অর্থনৈতিক (non-economic) প্রতিবন্ধকতা থাকলে ব্যক্তিখাত বাড়তি এক একক বিনিয়োগের প্রান্তিক ব্যয় হিসাব করার সময় সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত কিছু ব্যয়ও হিসাব (Non Economic Cost) করে। ফলে ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থায় যে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয় তা সব সময় কাম্য অবস্থার চেয়ে কম হয় (Sub-optimal)।

অবস্থাদৃষ্টে বাংলাদেশের ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগও বর্তমানে Sub-optimal অবস্থায় আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কাম্য পর্যায়ের সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বাধাসমূহ অপসারণের জন্য সরকারের কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক যার মধ্যে রয়েছে সরকারের নিজের বিনিয়োগ বাড়ানো এবং অবশ্যই তা উৎপাদনশীল বিনিয়োগ। এতে দু'দিক থেকেই কল্যাণ সাধিত হবে। প্রথমত সরকারি বিনিয়োগ বাড়ার কারণে বাজারে বিদ্যমান অলস সঞ্চয় সরাসরি উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হবে। অপর দিকে সরকারি বিনিয়োগের কারণে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের প্রান্তিক ব্যয় কমে আসবে যা ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে। সরকারি এবং ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ একে অপরের পরিপূরক হয়ে অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বাড়াবে ফলে দ্রুততার সাথে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। এতে ব্যক্তিখাতের সঞ্চয় ক্ষমতা বাড়বে। বাড়তি সঞ্চয়ের পুরোটা বাজার Absorb করতে না পারলে অবশিষ্টাংশ সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় অর্থনীতিতে বর্তমান বিদ্যমান নিম্নআয় স্তরের ভারসাম্য ফাঁদের (Low Income Level Equilibrium Trap) অবস্থা হতে বেরিয়ে এসে অর্থনীতি এক উচ্চ আয় স্তরে ভারসাম্য খুঁজে পাবে যেখানে থাকবে উচ্চ মাথাপিছু মূলধন এবং উচ্চ ভোগ।

১১.৩ ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ চাংগা করার জন্য স্থিতিশীল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি নীতি আদর্শের ধারবাহিকতা রক্ষাও প্রয়োজন। ব্যবসার পরিবেশ সংক্রান্ত ১৫টি বিষয়ের উপর পরিচালিত বিশ্ব ব্যাংকের জরিপের ফলাফল[১৯] বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৩৬.৭ ভাগ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বাংলাদেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অথচ ২০০৭ সালে মাত্র ১১.৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান একে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ২০০৭ সালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো (৪২.৭ শতাংশ) বিদ্যুৎ সমস্যাকে তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল যা ২০১৩ সালে দ্বিতীয় অবস্থানে (২৭.৮ শতাংশ) নেমে গেছে। ২০১৩ সালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন ও ভূমি প্রাপ্তির অসুবিধা ২০০৭ সালের তুলনায় বেশ কমেছে। তবে দুর্নীতি এবং দক্ষ শ্রম-শক্তির অভাবকে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসব সমস্যা সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার।

১১.৪ বর্তমান বাস্তবতায় সরকারের উৎপাদনশীল বিনিয়োগের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বিনিয়োগ হতে পারে ভৌত অবকাঠামো খাতে। দেশের রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, বন্দরসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহসহ ভৌত অবকাঠামো খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে পিপিপি ও এফডিআই এর আওতায়ও এসব খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। উল্লেখ্য, বিগত বছরসমূহের পিপিপি'র আওতায় বিনিয়োগ প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি তবে ইতোমধ্যে পিপিপি প্রকল্পসমূহ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড়িয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে অবকাঠামোজনিত বাধা (Infrastructural Bottleneck) দূর হবে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। দেশব্যাপী যোগাযোগ অবকাঠামোর কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হলে দেশের আনাচে কানাচে শিল্পায়ন হবে যা দেশের বিদ্যমান বিশাল জনশক্তিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ নিয়োগের দিকে চালিত করবে। এ জন্য সরকারের চলতি ব্যয় জিডিপি'র শতকরা ১০ ভাগে স্থির রেখে আগামী ৫ বছরের মধ্যে মূলধন ব্যয়কে জিডিপি'র শতকরা ১২ ভাগে উন্নীত করে মোট সরকারি ব্যয় জিডিপি'র শতকরা ২২ ভাগে নির্ধারণ করা সমীচীন হবে।

১১.৫ সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত হতে পারে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই শ্রমের দক্ষতা বাড়ায় এবং প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে এবং প্রবৃদ্ধিকে অধিকতর অন্তর্ভূক্তিমূলক করে। শিক্ষা খাতে সাধারণ শিক্ষার তুলনায় কারিগরি শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রবাসে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী

[১৯] বাংলাদেশের ৪টি সক্রিয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের ১,৪৪২টি প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর জরিপ চালিয়ে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ পর্যালোচনা করে থাকে। এরূপ প্রথম জরিপ পরিচালিত হয়েছিল ২০০৭ সালে। সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় এপ্রিল ২০১৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময়ে। ব্যবসার পরিবেশ মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রত্যেকটি ফার্মের কর্মদক্ষতাও মূল্যায়িত হয় এই জরিপে।

দেশের চাহিদা মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করা আবশ্যক। স্বাস্থ্য খাতের জন্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে হবে। মনে রাখতে হবে বর্তমানে মাথাপিছু মূলধন বৃদ্ধির যে ধারা দেখা যাচ্ছে তার অনেকটার দাবীদারই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

১১.৬ সরকার দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে। যেমনঃ আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জাম নিশ্চিত করা; ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম যেমনঃ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুতকরণ এবং এসব কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য প্রকৃত অর্থেই লক্ষ্যভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পুলিশ, শিক্ষা, আদালত, স্বাস্থ্য এই সব খাতে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করলে দুর্নীতি নিরসনে ব্যাপক সুফল পাওয়া যাবে বলে ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমে জোর দিতে হবে। সরকারের এ ধরনের কার্যক্রমকে দেশের অদৃশ্য মূলধন[২০] (Intangible Capital) বলা যায় যা ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

১১.৭ উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে ভূমির যোগান সীমিত। বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে উত্তম ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নীতিমালা ব্যতিরেকে প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখা সম্ভব নয়। এ কারণে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর (ডিজিটাল ভূমি রেকর্ডস পদ্ধতি) ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ভূমি জোনিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

১১.৮ শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের উপস্থিতি ব্যতিত সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচনমূলক নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন দুরূহ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে কার্যকরভাবে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌছানো যায়। এ কারণে প্রশাসনিক সংস্কার ও স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

১১.৯ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই কর-রাজস্ব আয় বিশেষ করে আয়কর বৃদ্ধি করা উচিত। এ জন্য করের হার (Tax base) ও করের আওতা (Tax net) উভয়ই সম্প্রসারণ করতে হবে[২১]। সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির সুবাদে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা ৫ ভাগের বেশি করা উচিত হবে না। বর্তমানে দেশের চাষযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে এবং বিপরীতক্রমে অকৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অকৃষি জমির কর হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পদ কর প্রদান উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

১১.১০ বাংলাদেশের আয় বন্টনের অসমতা নিয়ে অনেক সমালোচনা থাকলেও বিশ্বের সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও খারাপ নয়। সাধারণত অসমতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্রদের অনুকূলে আয় পুনর্বন্টন (Redistribution) করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভর্তুকি এবং স্থানান্তর ব্যয় বৃদ্ধির একটি তাগিদ

---

[২০] WHERE IS THE Wealth of NATIONS? Measuring Capital for the 21st Century, THE WORLD BANK, Washington, D.C.

[২১] রুবিনসন (১৯৭৭) এর গবেষণা মোতাবেক কর আয়ভিত্তিক সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি উচ্চ প্রবৃদ্ধির সহায়ক।

সৃষ্টি হয়। যেহেতু সরকারের বাজেট সীমিত সেহেতু এ ধরনের ব্যয় বাড়াতে গেলে সরকারের মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি করা দুরূহ হয়ে পড়ে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বর্তমানে বিদ্যমান ব্যয় জিডিপি'র ২ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখাই সঙ্গত হবে। তবে অক্ষম, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যারা অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতে অবদান রাখতে পারবে না তাদের জন্য চলমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বহাল রাখতে হবে[২২]। তবে বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি এবং তা বহু মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। ফলে, এসব কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত উপকারভোগী বাছাই, উপকারভোগী নির্বাচনে দ্বৈততার সমস্যা, কর্মসূচিগুলোর সুফল অতিদরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে সঞ্চালন এবং এদের উচ্চ পরিচালনা ব্যয়সহ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSPS) প্রণয়ন করতে হবে যেখানে বিদ্যমান নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে আরো সুসংহত এবং লক্ষ্যাভিমুখ করা এবং এতে কর্মসংস্থান ও সামাজিক বীমা নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করে এর পরিধি বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

১১.১১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল রাখতে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে (Research and Development) সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে দেশের চাষযোগ্য জমি ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্য অচিরেই আমাদের দুর্যোগ, খরা, লবণাক্ততা সহিষ্ণু শস্য বীজ উদ্ভাবনসহ লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate Technology) উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প খাতে বিনিয়োগে আমাদেরকে Low-end Product থেকে High-end Product উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে। তবে এও লক্ষ্য রাখতে হবে, শ্রমঘন শিল্প (Labour Intensive Industry) যেমনঃ রেডিমেড গার্মেন্টস, চামড়া শিল্প, পাট শিল্প, খেলনা বা আসবাপত্র নির্মাণ ইত্যাদি খাতের বিনিয়োগও যেন অব্যাহত থাকে। এ সকল বিষয়সমূহ অনুধাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার।

১১.১২ অর্থনীতির দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে ধীরে ধীরে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়; তাতে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী নিজেরাই দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দেশের শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে সরকার দেশি-বিদেশি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে[২৩]।

---

[২২] একটি সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSPS) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত কৌশলে বিদ্যমান নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে আরো সুসংহত এবং লক্ষ্যাভিমুখ করা এবং এতে কর্মসংস্থান ও সামাজিক বীমা নীতিমালা অন্তর্ভূক্ত করে এর পরিধি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

[২৩] অর্থবিভাগ সম্প্রতি শ্রম-শক্তির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১০ বছরে ১.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয়ের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেখানে ১ম পর্যায়ে প্রথম ৪ বছরে ১৪৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয় হবে, যা দেশের বেসরকারি খাতে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করবে মর্মে আশা করা যায়।

২০০৩-১২ সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় এবং দারিদ্র পরিস্থিতি

ক্রঃ নং	দেশের নাম	গড় মাথাপিছু আয় (২০০৫ সালের স্থির ডলার মূল্য)	হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার (সর্ব নিম্ন)	দারিদ্র ব্যবধান (সর্বনিম্ন)	সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	গিনি সূচক (সর্ব নিম্ন)
০১	গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো	১৪২.৬	৭১.৩	৩২.২	৩৪.৬৯	২.২৯	৪৪.৪৩
০২	বুরুন্ডি	১৪৮.৮	৬৬.৯	২৩.৪	২৮.০৪	৪.১৪	৩৩.২৭
০৩	ইথিওপিয়া	১৯৭.১	২৯.৬	৭.৮	২৬.৫৭	৩.৬৩	২৯.৮৩
০৪	লাইবেরিয়া	২০৬.৮	৬৩.৮	২৪.৪	৩০.১	২.৩৫	৩৮.১৬
০৫	মালয়	২২১.৭	৫০.৭	১৭.৮	৩৩.৩৮	২.৬৮	৩৯.০২
০৬	নাইজার	২৬৮.৩	৫৯.৫	১৯.৬	৩২.০৯	২.৯৪	৩৪.৫৫
০৭	মাদাগাসকার	২৭৮.৯	৭৫	৩২	৩৮.১১	২.৪১	৪৪.১১
০৮	গিনি	৩০৫.৩	৫৩	১৭.৬	৩১.২৯	২.৬১	৩৯.৩৫
০৯	আফগানিস্তান	৩০৫.৪	৩৬	৭.৯	২৩.২১	৪.০৮	২৭.৮২
১০	রুয়ান্ডা	৩১৪.৫	৪৪.৯	১৪.৮	৪৪.১৯	১.৯৭	৫০.৮২
১১	মোজাম্বিক	৩৪৬.৬	৫৪.১	২০.৫	৩৭.৯৭	২.০৩	৪৫.৬৬
১২	নেপাল	৩৪৮.০	২৫.২	৫.৪	৩১.৬১	৩.২৭	৩২.৮২
১৩	সিয়েরা লিওন	৩৫১.৭	৫২.৯	১৬.১	৩১.১৬	৩.০৩	৩৫.৩৫
১৪	উগান্ডা	৩৫৬.১	২৪.৫	৬.৮	৩৫.০৯	২.৪৭	৪২.৬২
১৫	তাজিকিস্তান	৩৮০.৮	৪৭.২	০	২৫.৫৩	৩.১৮	৩০.৮৩
১৬	টোগো	৩৯১.০	৫৮.৭	২৩.৬	২৮.২৪	২.৮৫	৩৪.৪১
১৭	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৩৯২.১	৬২	৩৩.১	৩৯.৫৮	১.৬৬	৪৩.৫৭
১৮	গিনি বিসাউ	৪১১.০	৬৯.৩	-	-	-	-
১৯	তানজানিয়া	৪১২.৯	২৮.২	৬.৭	২৯.৬১	২.৮২	৩৭.৫৮
২০	জিম্বাবুয়ে	৪২৫.৫	৭২.৩	৩৪.১	-	-	-
২১	বারকিনা ফাসো	৪৩০.৪	৪৬.৭	১৫.১	৩২.৩০	২.৯৪	৩৯.৬
২২	জাম্বিয়া	৪৪০.৮	৪৮.৪	২৭.৯	৩৬.৯৪	১.৯৫	৪৭.২৮
২৩	হাইতি	৪৫৫.৪	-	-	-	-	-
২৪	মালি	৪৬৯.৪	৪৩.৬	১৩.২	২৮.১৯	৩.১	৩৩.০২
২৫	বাংলাদেশ	৪৮২.৯	৩১.৫১	৬.৫৪	২৭.৫৮	৩.৯৮	৩২.১২
২৬	গণপ্রজাতন্ত্রী কিরগিজস্তান	৫২৭.৬	৩১.৭	৬.১	২৮.৫৪	৩.০৯	৩৩.৩৮
২৭	কম্বোডিয়া	৫৪৩.৮	২০.৫	৪.২	৩৩.৩২	৩.২২	৩৬.০৩
২৮	বেনিন	৫৪৫.৯	৩৩.৩	৯.৫	৩১.২৪	৩	৩৮.৬২
২৯	কেনিয়া	৫৫০.৫	৪৫.৯	১৬.৩	৩৭.৯৯	১.৯৬	৪৭.৬৮
৩০	লাউস	৫৫৩.৯	২৭.৬	৬.৫	৩০.৩৩	৩.৩৪	৩৬.৭৪
৩১	তিমোর-লেসতে	৫৫৬.০	৪৯.৯	১৩.৬	-	-	-

ক্রঃ নং	দেশের নাম	গড় মাথাপিছু আয় (২০০৫ সালের স্থির ডলার মূল্য)	হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার (সর্ব নিম্ন)	দারিদ্র ব্যবধান (সর্বনিম্ন)	সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	গিনি সূচক (সর্ব নিম্ন)
৩২	ঘানা	৫৬৯.০	২৮.৫	৯.৬	৩২.৭৫	২.০৩	৪২.৭৬
৩৩	কমোরোস	৬২২.৩	৪৪.৮	১৬.৩	৫৫.১৯	০.৯১	৬৪.৩
৩৪	চাঁদ	৬৪৪.৯	৪৬.৭	১৯.৭	৩০.৭৯	২.৬১	৩৯.৭৮
৩৫	উজবেকিস্তান	৬৫৩.১	১৬	০	২৯.৪৭	২.৮৫	৩৬.৭২
৩৬	জাম্বিয়া	৬৮৫.১	৬০.৫	২৮	৪০.৮২	১.৭১	৪২.০৮
৩৭	পাকিস্তান	৭২০.৪	২২.৩	০	২৭.০২	৪.১৪	৩০.০২
৩৮	সুদান	৭৪৪.৯	৪৬.৫	১৬.২	২৬.৭২	২.৭৪	৩৫.২৯
৩৯	মৌরিতানিয়া	৭৫৬.৬	৪২	১৪.৫	৩২.৪০	২.৪৯	৪০.৪৬
৪০	সাওতোমে ও প্রিন্সিপে	৭৭৮.১	৬১.৭	২৩	-	-	০
৪১	সেনেগাল	৭৭৮.৫	৪৬.৭	১৪.৫	৩০.৬২	২.৫১	৩৯.১৯
৪২	লিসোথো	৭৯২.৮	৫৬.৬	০	৩৯.৪	০.৯৯	৫২.৫
৪৩	ভিয়েতনাম	৮০০.৯	১৭.২	৪.৫	২৮.৩৩	৩.১০	৩৫.৫৭
৪৪	গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়েমেন	৮৩২.২	৩৪.৮	৮.৯	৩০.৮২	২.৯১	৩৭.৬৯
৪৫	ভারত	৮৮০.৯	২১.৯	৪	২৮.৫৩	৩.৭২	৩৩.৩৮
৪৬	নাইজেরিয়া	৮৮৬.৬	৪৬	১৭	৩৫.৩৩	১.৮৭	৪২.৯৩
৪৭	পাপুয়া নিউগিনি	৮৮৭.৪	৩৯.৯	১৫.৭	-	-	০
৪৮	মলডোভা	৯০৫.৩	১৬.৬	২.৯	২৭.৫৫	৩.০৪	৩৩.০৩
৪৯	জিবুতি	৯২১.২	০	০	-	-	০
৫০	ক্যামেরুন	৯২৭.৮	৩৯.৯	১২.৩	৩০.৩৬	২.৯১	৩৮.৯১
৫১	আইভরিকোস্ট	৯৩৯.৭	৪২.৭	১৫.৩	৩১.৭৫	২.২৩	৪১.৫
৫২	সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	৯৮৭.৫	২২.৭	৭.৫	-	-	০
৫৩	বলিভিয়া	১১০৫.৫	৫১.৩	০	৪৪.০৭	০.৫২	৫৬.২৯
৫৪	গায়ানা	১১৩৯.১	০	০	-	-	০
৫৫	কিরিবাতি	১১৫৯.২	০	০	-	-	০
৫৬	পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা	১১৬৮.১	২১.৯	৪.৯	২৯.১৭	২.৯৪	৩৫.৫
৫৭	মঙ্গোলিয়া	১১৮৭.৭	২৭.৪	০	২৮.৩৮	৩.০৪	৩৬.৫২
৫৮	নিকারাগুয়া	১২১৯.৩	৪২.৫	০	৩১.৫১	২.৬১	৪০.৪৭
৫৯	ফিলিপাইন	১৩০২.০	২৪.৯	৫.১	৩৩.৯৪	২.৪৪	৪২.৯৮
৬০	মিশর	১৩৯৬.৬	১৯.৬	৩.৬	২৭.১	৩.৯১	৩০.৭৭
৬১	ইন্দোনেশিয়া	১৪২৯.১	১১.৪	১.৮	২৮.৭৯	৩.৪৫	৩৪.০১
৬২	শ্রীলংকা	১৪৪৮.০	৮.৯	১.৭	৩১.৪৯	৩.২২	৩৬.৪
৬৩	হন্ডুরাস	১৪৭০.৯	৫৮.৩	০	৪৫.০৪	০.৫৬	৫৬.১৬
৬৪	ভুটান	১৫৪৩.৭	১২	২.৬	৩২.৫৬	২.৬৫	৩৮.০৬
৬৫	সিরিয়া	১৫৬৮.৮	০	০	২৮.৯৩	৩.৩৬	৩৫.৭৮
৬৬	প্যারাগুয়ে	১৫৯১.২	৩২.৪	৩৭.৯	৪১.৯৭	১.০৫	৫১.০৪

ক্রঃ নং	দেশের নাম	গড় মাথাপিছু আয় (২০০৫ সালের স্থির ডলার মূল্য)	হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার (সর্ব নিম্ন)	দারিদ্র ব্যবধান (সর্বনিম্ন)	সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	গিনি সূচক (সর্ব নিম্ন)
৬৭	জর্জিয়া	১৬৯৮.৫	১৪.৮	৪.৩	৩১.০৬	২.০৯	৩৯.৩৭
৬৮	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	১৭৭৬.২	৪৬.৫	০	৩৭.০৫	২.০৮	৪৭.৩২
৬৯	আরমেনিয়া	১৮৮৩.০	২৭.৬	৫.১	২৭.৯৬	৩.৫৫	৩০.২৩
৭০	ইউক্রেন	১৯৫২.৮	২.৯	০.৪	২২.৮০	৩.৯৭	২৫.৬২
৭১	ইরাক	১৯৭৮.৯	১৯.৮	৪.২	২৫.২৪	৩.৭৯	৩০.৮৬
৭২	ভানুয়াতু	২০২১.১	০	০	-	-	০
৭৩	মরোক্কো	২১৭১.৬	৯	০	৩৩.২২	২.৬৬	৪০.৮৮
৭৪	এ্যাঙ্গোলা	২১৯৭.৪	৩৬.৬	১২.৭	৩২.৩৭	২.১৮	৪২.৬৬
৭৫	তুর্কেমেনিস্তান	২২২৮.৫	০	০	-	-	০
৭৬	গুয়েতেমালা	২২৩৫.৪	৫১	০	৪২.২১	০.৬৪	৫৪.৫
৭৮	সামোয়া	২২৯৬.৫	০	০	-	-	০
৭৭	চীন	২৩২২.২	০	০	৩১	১.৭৫	৪২.০৬
৭৮	মাইক্রোনেশিয়া	২৩৫৪.০	০	০	-	-	০
৮০	সোয়াজিল্যান্ড	২৩৮০.৮	৬৩	৩০.৪	৪০.১২	১.৬৬	৫১.৪৯
৮১	আজারবাইজান	২৩৮৫.৪	৬	২	২৭.৩৭	৩.৪৩	৩৩.৭১
৮২	কসোভো	২৪৪৬.৬	২৯.২	৭.৩	-	-	০
৮৩	টুভুলু	২৪৫১.১	০	০	-	-	০
৮৪	টোঙ্গা	২৫৬২.৩	০	০	-	-	০
৮৫	জর্ডান	২৫৬৮.২	১৩	২.৬	২৯.৪১	৩.২৩	৩৩.৮২
৮৬	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	২৭১৪.৪	০	০	-	-	০
৮৭	কেপ ভারদে	২৭৪১.৯	২৬.৬	৮.১	-	-	০
৮৮	এল সালভেদর	২৯১০.০	৩০.৭	০	৩৬.৫৬	১.০৮	৪৬.১৯
৮৯	থাইল্যান্ড	২৯১২.৭	১৩.২	০	৩১.৮৯	২.৭২	৩৯.৩৭
৯০	ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান	২৯৭৮.৪	০	০	২৯.৬৩	২.৬২	৩৮.২৮
৯১	আলবেনিয়া	৩০০৩.৫	১২.৪	২.৩	২৬.৪৮	৩.৪৩	৩১.০৯
৯২	আলজেরিয়া	৩০৬৩.৬	০	০	-	-	০
৯৩	বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা	৩০৯৯.৫	১৪	০	২৭.৪৭	২.৮০	৩৫.৭৮
৯৪	মেসিডোনিয়া	৩১৪৪.০	২৭.১	০	৩১.৩২	২.১৯	৩৮.৮৫
৯৫	ইকুয়েডর	৩১৫৮.৭	২৭.৩	০	৪১.০৯	১.১০	৪৯.২৬
৯৬	পেরু	৩৩৮০.৩	২৫.৮	৭.১	৩৮.৮৭	১.৩৩	৪৮.১৪
৯৭	তিউনিসিয়া	৩৪৮৮.৭	১৫.৫	০	৩০.০২	২.৫২	৩৬.০৬
৯৮	ফিজি	৩৫৯৮.৭	৩৫.২	৯.৯	৩৪.৮	২.০৮	৪২.৮৩
৯৯	সার্বিয়া	৩৬০৩.২	২৪.৬	০	২৪.২০	৩.৪৪	২৭.৮
১০০	কলম্বিয়া	৩৭১৯.২	৩২.৭	১২.৯	৪৫.৮৮	০.৬৬	৫৫.৯১
১০১	বেলারুশ	৩৮২৬.৫	৫.২	০	২২.১৮	৩.৭৭	২৬.২২

ক্রঃ নং	দেশের নাম	গড় মাথাপিছু আয় (২০০৫ সালের স্থির ডলার মূল্য)	হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার (সর্ব নিম্ন)	দারিদ্র ব্যবধান (সর্বনিম্ন)	সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	গিনি সূচক (সর্ব নিম্ন)
১০২	নামিবিয়া	৩৮৬৪.৮	২৮.৭	৮.৮	৫৪.৭৫	১.৩৯	৬৩.৯
১০৩	সুরিনাম	৩৮৮০.৬	০	০	-	-	০
১০৪	বেলিজ	৪১২৭.২	০	০	-	-	০
১০৫	বুলগেরিয়া	৪১৫৩.৩	১০.৬	৩	২২.৯৭	৩.৩৭	২৮.১৯
১০৬	মন্টিনিগ্রো	৪১৮৬.৪	৪.৯	০.৯	২৩.৬৭	৩.৫৩	২৮.৫৮
১০৭	জ্যামাইকা	৪১৮৯.৭	৯.৯	০	৩৫.৯	২.২৫	৪৫.৫১
১০৮	মালদ্বীপ	৪২২৪.৫	০	০	২৮.০৩	২.৭১	৩৭.৩৭
১০৯	গণপ্রজাতন্ত্রী ডমিনিকান	৪২২৫.৫	৪০.৪	০	৩৯.৫৬	১.৫৪	৪৭.২
১১০	কিউবা	৪২৯৪.৫	০	০	-	-	০
১১১	কাজাখস্তান	৪২৯৫.৭	৩.৮	০.৫	২৫.০১	৩.৭০	২৯.০৪
১১২	আর্জেন্টিনা	৪৫৬৭.৪	০	০	৩৫.৩৫	১.১৫	৪৪.৪৯
১১৩	কোস্টারিকা	৫০৬৭.৫	২০.৩	০	৩৭.৭২	১.২৬	৪৭.৬৩
১১৪	ব্রাজিল	৫১৫০.১	১৫.৯	০	৪৪.৫৬	০.৭১	৫৪.৬৯
১১৫	রোমানিয়া	৫২৬৩.১	১৩.৮	৩.২	২৩.৮৩	৩.৩৮	২৪.২৪
১১৬	সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রানাডাস	৫৩৫৩.১	০	০	-	-	০
১১৭	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৪৭৮.০	২৩	৭	৫৪.৬২	১.১২	৬৩.১৪
১১৮	পানামা	৫৫৭৭.০	২৭.৬	০	৪১.২৫	০.৯২	৫১.৯২
১১৯	মৌরিতাস	৫৬১৬.৩	০	০	-	-	০
১২০	ডমিনিকান রিপাবলিক	৫৮২০.৩	০	০	-	-	০
১২১	গণপ্রজাতন্ত্রী ভেনিজুয়েলা	৫৮২৫.২	২৫.৪	০	৩৪.৮০	০.৭৯	৪৪.৭৭
১২২	বতসোয়ানা	৫৮৪৮.৭	১৯.৩	১১.৭	-	-	০
১২৩	সেন্ট লুসিয়া	৫৮৫৪.৫	০	০	-	-	০
১২৪	মালয়েশিয়া	৫৯৬২.৪	১.৭	০.৮	৩২.৭৩	২.১১	৩৭.৯১
১২৫	রাশিয়ান ফেডারেশন	৫৯৭০.৭	১১	১	৩১.০৫	২.৫৯	৩৭.১৪
১২৬	উরুগুয়ে	৫৯৯০.২	১২.৪	০	৩৫.২৪	১.৭৭	৪৫.৩২
১২৭	লেবানন	৬১৪৬.৬	০	০	-	-	০
১২৮	গ্যাবন	৬৩১৫.১	৩২.৭	১০	৩২.৯৫	২.৫৮	৪১.৪৫
১২৯	গ্রেনাডা	৬৫০৬.৮	০	০	-	-	০
১৩০	তুরস্ক	৭৫০০.৯	১৭.১	০	৩০.৮৯	২.০৯	৩৮.৭৩
১৩১	লাটভিয়া	৭৬২৩.৬	৫.৯	০	২৭.৮৯	২.৭১	৩৪.৮১
১৩২	লিবিয়া	৮০৬৩.৪	০	০	-	-	০
১৩৩	মেক্সিকো	৮০৬৬.১	৪২.৯	০	৩৮.০৭	১.৭২	৪৬.০৫
১৩৪	চিলি	৮১৬০.৩	১৩.৭	০	৪৩.২৪	১.৪৮	৫১.৮৪
১৩৫	লিথুয়ানিয়া	৮৬৪৮.৮	০	০	২৮.৩৫	২.৬৮	৩৫.৮১

ক্রঃ নং	দেশের নাম	গড় মাথাপিছু আয় (২০০৫ সালের স্থির ডলার মূল্য)	হেডকাউন্ট দারিদ্রের হার (সর্ব নিম্ন)	দারিদ্র ব্যবধান (সর্বনিম্ন)	সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয় (মোট আয়ের অংশ, গড়)	গিনি সূচক (সর্ব নিম্ন)
১৩৬	পোল্যান্ড	৯০৫৯.৬	১০.৬	০	২৬.৮৮	৩.১৬	৩২.৭৩
১৩৭	পাউলো	৯৫০৪.৭	০	০	-	-	০
১৩৮	ক্রোয়েশিয়া	১০৪৪৯.৫	১১.১	২.৬	২৫.৩৫	৩.৫২	২৮.৯৯
১৩৯	এস্তোনিয়া	১০৭৭৪.১	০	০	২৭.৭৮	২.৬৭	৩৫.৭৮
১৪০	হাঙ্গেরি	১০৯৫৮.৪	০	০	২৪.৮৭	৩.৫৮	৩০.০৪
১৪১	সিসিলিস	১২২৫৩.০	১৩.৪	৯.৩	৬০.১৬	১.৬৪	৬৫.৭৭
১৪২	গণপ্রজাতন্ত্রী স্লোভাকিয়া	১৩০৩১.৫	০	০	২৩.৭৭	৪.০৬	২৬.০০
১৪৩	স্লোভেনিয়া	১৮৬৮০.৯	০	০	২৪.২৩	৩.৪১	৩০.৮২
১৪৪	কাতার	৫৭২৫৪.৯	০	০	৩৫.৯	১.৩	৪১.১০
১৪৫	দক্ষিণ সুদান	-	৫০.৬	২৩.৭	-	-	৪৫.৫৩

উৎসঃ World Development Indicators-2013

সামাজিক গতিশীলতা ও অসমতা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

সামাজিক গতিশীলতা না থাকলে প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভূক্তিমূলক হয় না। সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সামাজিক গতিশীলতা একটি ব্যাপকতর ধারণা যেখানে পিতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার (পেশা, আয়, সামাজিক শ্রেণী ইত্যাদি) সাথে সন্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক আলোচিত হয়। এই সম্পর্ক যদি খুব জোরালো থাকে তাহলে সামাজিক গতিশীলতা কম বলে বিবেচিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ধনী (গরীব) পরিবারের সন্তানেরা ধনীই (গরীবই) থাকে। সামাজিক গতিশীলতার অনুপস্থিতিতে সমাজের অসম অবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা সংখ্যায় পরিমাপ করা আবশ্যক। এর জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতি হলো আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা (Intergenerational Elasticity in Earning) পরিমাপ করা যেখানে পূর্ববর্তী প্রজন্মের আয়ের শতকরা পরিবর্তন সাপেক্ষে পরবর্তী প্রজন্মের আয়ের শতকরা পরিবর্তন হিসাব করা হয়। এই স্থিতিস্থাপকতার মান সর্বোচ্চ ১ এর সমান হতে পারে আর যার অর্থ গরীব (ধনী) পরিবারের সন্তানেরা গরীবই (ধনী) থাকবে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা শূন্য। আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যত কম সমাজ তত গতিশীল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার মান ০.৩৫ হলে সন্তানের আয়ের পরিবর্তনের মাত্র ৩৫ শতাংশ পিতার আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতাঃ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

মাইলস কোরাক ২০১২ সালে প্রকাশিত তার "Inequality from Generation to Generation: the United States in Comparison" প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ মোট ২২টি দেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা হিসাব প্রকাশ করেছেন যা নিম্নের ছকে দেখানো হলোঃ

টেবিল-১ ঃ বিভিন্ন দেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা

দেশের নাম	আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা	দেশের নাম	আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা
পেরু	০.৬৭	ফ্রান্স	০.৪১
চীন	০.৬০	স্পেন	০.৪০
ব্রাজিল	০.৫৮	জাপান	০.৩৪
চিলি	০.৫২	জার্মানি	০.৩২
যুক্তরাজ্য	০.৫০	নিউজিল্যান্ড	০.২৯
ইটালি	০.৫০	সুইডেন	০.২৭
আর্জেন্টিনা	০.৪৯	অস্ট্রেলিয়া	০.২৬
যুক্তরাষ্ট্র	০.৪৭	কানাডা	০.১৯
সুইজারল্যান্ড	০.৪৬	ফিনল্যান্ড	০.১৮
পাকিস্তান	০.৪৬	নরওয়ে	০.১৭
সিংগাপুর	০.৪৪	ডেনমার্ক	০.১৫

ছকে দেখা যাচ্ছে যে, ২২টি দেশের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা সবচেয়ে কম পেরুতে যেখানে বর্তমান প্রজন্মের সন্তানদের আয়ের ৬৭ শতাংশই নির্ভর করে তাদের পিতা-মাতার আয়ের ওপর। অপরদিকে ডেনমার্কে সন্তানদের আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ তাদের পিতা-মাতার আয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বর্ণিত দেশগুলোর মধ্যে ডেনমার্কে সামাজিক গতিশীলতা সবচেয়ে বেশি।

চিত্রঃ আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা ও অসমতা

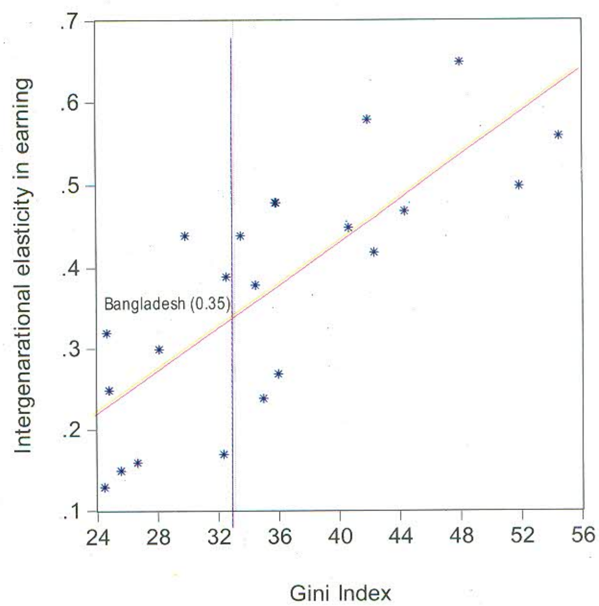

কোরাক (২০১২) তার গবেষণায় আরো দেখান যে, আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পেলে অসমতাও বাড়ে। তিনি ০১নং ছকে বর্ণিত আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর গিনি সূচক প্লট করেন এবং এ দুটি চলকের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক দেখতে পান যা ১নং চিত্রে দেখানো হলো। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব দেশে আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা বেশি সেসব দেশে অসমতাও বেশি। অর্থাৎ সামাজিক গতিশীলতা যত কম আয় বন্টনে বৈষম্য তত বেশি।

বাংলাদেশের সামাজিক গতিশীলতা

বাংলাদেশের সামাজিক গতিশীলতা পরিমাপের জন্য সামগ্রিকভাবে দেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ সংক্রান্ত কোন নির্ভরযোগ্য গবেষণাকর্ম[২৪] নেই । তবে প্রত্যক্ষ কোন গবেষণা না থাকলেও বিভিন্ন দেশের তথ্যের ভিত্তিতে আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা এবং অসমতার মধ্যকার প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের আলোকে বাংলাদেশের সামাজিক গতিশীলতার সংখ্যাগত পরিমাপ সম্পর্কে কিছুটা যুক্তিসংগত অনুমান করা যায়। ১নং চিত্রের ভূমি অক্ষে গিনি সূচক এবং লম্ব অক্ষে আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা দেখানো হয়েছে। লাল রঙের সরল রেখাটি হলো গিনি সূচকের প্রত্যেকটি মানের বিপরীতে আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকার গড়মান নির্দেশক সরল রিগ্রেশন রেখা। গিনি সূচকের মান জানা থাকলে এই রেখার দ্বারা আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকার সম্ভাব্য মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আর এই কৌশলের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সামাজিক গতিশীলতা বিষয়ে একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব। যেমন বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে ২০১০ সালে বাংলাদেশের গিনি সূচকের মান ছিল ৩২.১২ যার বিপরীতে আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার গড়

[২৪] তবে বাংলাদেশের চাঁদপুর উপজেলার ১৪১টি গ্রামের ১৯৭৪-৯৬ সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে আসাদুল্লা (২০১১) পিতা-পুত্রের সম্পদের মধ্যকার কো-রিলেশন সহগের মান ০.৫৩ হতে ০.৭৭ এর মধ্যে পরিমাপ করেছেন।

মান ০.৩৫[২৫] । কোরাকের গবেষণায় নমুনাভূক্ত দেশগুলোর অধিকাংশই উন্নত দেশ। কাজেই এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের বেলায় প্রযোজ্য কিনা তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। তবে গিনি সূচকের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সংশয় অনেকটাই দূরীভূত হয়। প্রথমটি হলো গিনি সূচক গড় নিরপেক্ষ (Mean Independence)। অর্থাৎ সমাজের সবার আয় দ্বিগুন হলে গিনি সূচকের মান পরিবর্তন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র দেশ নির্বিশেষে গিনি সূচক একই অর্থ বহন করে। দ্বিতীয়টি হলো গিনি সূচক দেশের জনসংখ্যার আকার নিরপেক্ষ (Population Size Independence)। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তিত হলেও অন্যান্য অবস্থা ধ্রুব থাকা অবস্থায় গিনি সূচকের কোন পরিবর্তন হয় না। এ কারণে দেশের আকারভেদে গিনি সূচক একই অর্থ বহন করে। তৃতীয়টি হলো গিনি সূচক ব্যক্তি নিরপেক্ষ (Symmetry)। অর্থাৎ দুজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে স্ব-স্ব আয় বদল করলে তার প্রভাব গিনি সূচকের ওপর পড়েনা।

গিনি সূচকের এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে কোরাকের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের প্রয়োগ বাংলাদেশসহ সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে বড় কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না। তবে বিষয়টিকে এতটা সরলভাবে বিবেচনারও সুযোগ কম। কারণ, সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবার, শ্রম বাজার এবং রাষ্ট্রীয় নীতি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। শিশুর পরিণত বয়সের সক্ষমতা লাভের প্রাথমিক উৎস হল পরিবার। যে সব শিশুদের বিকাশ প্রাচুর্যের মধ্যে ঘটে তারা অনুকূল পরিবেশে শারিরীক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে সামাজিক দক্ষতা অর্জনের কৌশলগুলো এমনভাবে রপ্ত করে যা তাদের ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য অর্জনের সোপান সৃষ্টি করে দেয়। এভাবে সক্ষম পরিবারের শিশুরা পরিণত বয়সে সফল পিতা-মাতার ভূমিকা পালন করতে পারে। অপরদিকে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনা ঘটে। তবে শিশুর ভবিষ্যত জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য, পরিবারের আকার, অভিভাবকসুলভ দক্ষতা, শিশুদের জন্য অভিভাবকের সময় ব্যয় করার প্রবণতা ইত্যাদির তারতম্যের কারণেও দেশে দেশে আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার দেশভিত্তিক পার্থক্য সৃষ্টির জন্য মানবিক মূলধনের ব্যয় এবং এর ভবিষ্যত রিটার্নের পার্থক্যও দায়ী। যেমন যে সব দেশে শিশু-পালন, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি বাজারভিত্তিক সে সব দেশে পরিবারসমূহের জন্য মানবিক মূলধন গঠন ব্যয়বহুল। এসব দেশে মানবিক মূলধনের প্রত্যাশিত উচ্চতর রিটার্ন এই খাতে উচ্চ বিনিয়োগের প্রণোদনা সৃষ্টি করবে। সলন (২০০৪) শিক্ষা বিনিয়োগের ভবিষ্যত উচ্চ প্রাপ্তির হারকে শ্রম-বাজারের অসমতার একটি নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন, যে সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম বাজারে অধিকতর ক্রস-সেকশন অসমতা বিদ্যমান (শিক্ষার উচ্চতর রিটার্ন), সেই সমাজের প্রজন্মগত গতিশীলতা কম। সলন (২০০৪) আরো উল্লেখ করেন সরকারের অনুসৃত নীতি-কৌশল অনেক ক্ষেত্রে শ্রমবাজারের অসমতা কমাতে ভূমিকা পালন করে। তিনি দেখান যে, প্রগতিশীল সরকারি প্রোগ্রাম প্রজন্মগত গতিশীলতা বাড়ায়। যেমন দু'টি দেশ জিডিপি'র অনুপাতে শিক্ষা খাতে সমান ব্যয় করলেও যে দেশ উচ্চতর শিক্ষায় কম ভর্তুকি দিয়ে গুণগতমান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য বেশি ব্যয়

---

[২৫] আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতাকে নির্ভরশীল এবং গিনি সূচককে অনির্ভরশীল চলক বিবেচনা করে OLS পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত

করবে সেই দেশ সামাজিকভাবে বেশি গতিশীল হবে। অন্যভাবে বলা যায় সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে পর্যাপ্ত ব্যয় করে যদি সকল নাগরিকদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে পারে তাহলে সমাজ তুলনামূলকভাবে অধিকতর গতিশীল হয়। আবার শ্রম বাজারে সরকারের কতিপয় পদক্ষেপ যেমন ন্যূনতম মজুরী আইন বাস্তবায়ন এবং সরকারি চাকুরিতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা প্রথা পালন সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই পরিবার, শ্রম বাজার এবং সরকারি কর্মপন্থার ভূমিকার ভিন্নতার কারণে সকল দেশের সামাজিক গতিশীলতা একইরূপ থাকেনা।

সামাজিক গতিশীলতার নিয়ামক উপাদান যেটাই হোক দেশের অসমতা হ্রাসের ক্ষেত্রে এটি যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে তা এই আলোচনার জন্য খুবই প্রাসংগিক। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভোগ বন্টনের ক্ষেত্রে যে তুলনামূলক উন্নত অবস্থানে আছে তার অন্যতম কারণ হলো স্বাধীনতার পর হতে সামাজিক গতিশীলতার ক্রম বর্ধমান অগ্রগতি। সামাজিক গতিশীলতা পরিমাপের জন্য দেশের আন্তঃপ্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার প্রত্যক্ষ কোন পরিমাপ আমাদের জানা না থাকলেও, বাংলাদেশে অসমতা পরিস্থিতিকে বিশ্ব পরিমন্ডলের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের আন্তঃ প্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতার মান ৩৪.৬ এর কাছাকাছি হওয়া যৌক্তিক (চিত্র-১)। এর অর্থ বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের আয় তাদের পূর্বপুরুষদের আয়ের উপর নির্ভরশীল নয় যা বাংলাদেশের উচ্চতর সামাজিক গতিশীলতা থাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। স্বাধীনতার পর হতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে দৃশ্যমান পরিবর্তন চোখে পড়ে তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সামাজিক গতিশীলতা সম্পর্কে এমন অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না।

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত উপায়ে সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতসহ অন্যান্য খাতে যে সকল দারিদ্র্যানুকূল ব্যয়নীতি অনুসরণ করে চলেছে তার প্রভাবে দেশের সকল নাগরিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগের সমান অধিকার পাচ্ছে। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল হওয়ায় মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ভোগ করছে। দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহ অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করায় সর্বস্তরের মানুষ মত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনগুলোও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে দেশের পরিবারগুলো তাদের পরের প্রজন্মের মানবিক মূলধন গঠনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। ফলে নতুন প্রজন্ম অধিকতর মেধাবী এবং সৃজনশীল শ্রম শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা উন্নত হওয়ায় নতুন প্রজন্মের তরুণ সমাজ অনেক সবল। এদের গড় উচ্চতাও বৃদ্ধি পাচেছ। সরকারি চাকুরিতে মেধার পাশাপাশি কোটা প্রথা চালু থাকায় সমাজের অনগ্রসর অংশের একাংশ উন্নত জীবনে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। বেসরকারি খাত বিকশিত হওয়ায় শিক্ষিত শ্রমশক্তির একটি অংশ উচ্চতর বেতনে চাকুরি করে আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। দেশের শিল্পখাত এবং ব্যবসার পরিবেশ ক্রমশ উন্নত হওয়ায় জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দরিদ্র পরিবার হতে বেরিয়ে এসে সফল ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি হতে পেরেছে। ক্রমবর্ধমান হারে প্রবাস নিয়োগ ও আয় বেড়েছে। প্রবাস আয়ের প্রভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমেই চাংগা হয়েছে। প্রবাস আয় বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র উন্নত হয়েছে এবং এর প্রভাবে এ সকল সামগ্রির সরবরাহকারীরাও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামীণ জীবনে মোবাইল ফোন,

টেলিভিশন, ফ্রিজ, এলপি গ্যাসের চুলা ইত্যাদি পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এসকল পণ্যের ব্যবসাও প্রসারিত হয়েছে। সমাজ জীবনে মানুষের পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী নির্যাতনের হার, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার, ধর্মীয় গোঁড়ামী ইত্যাদি কমেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে বর কনের পছন্দ ক্রমশই গুরুত্ব পাচ্ছে। গণপরিবহন ধুমপান মুক্ত হয়েছে। এরূপ আরো অনেক বিষয় আছে যা এই সীমিত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে এই আলোচনার মূল কথা হলো বাংলাদেশের সামাজিক গতিশীলতা যে পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং এর প্রভাবে সমাজের অসম অবস্থা ক্রমশই দূরীভূত হচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

References

Adams, R H. (2003) Economic Growth, Inequality, and Poverty: Findings from a New Data Set. World Bank, Washington, D.C.(World Bank Policy Research Working Paper No. 2972)

Asadullah M. Niaz(2011) Intergenerational Wealth Mobility in Rural Bangladesh, Discussion Paper No. 5914, University of Reading, SKOPE, University of Oxford and IZA

Bangladesh Economic Review, Issues 2000-2012, Ministry of Finance, Bangladesh

Barro, R. J. (1987). Government Spending, Interest Rates, Prices, and Budget Deficits in the United Kingdom, 1701- 1918.Journal of Monetary Economics, 20, 221-247, North Holland.

Barro, R. (1989). A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government. NBER Working Paper, 2855, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Barro, R. J. (1990). Human Capital and Growth: Theory and Evidence?A comment. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 32 (1990) 287-292 North-Holland.

Barro, R. J. (1990). Government Spending In a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98, s103-17

Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106, 407-443.

Barro, R. J. (1991). A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government. Volume of the National Bureau of Economic Research (pp. 271-304).

Barro, R. J. (1996). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. NBER Working Paper Series, No 5698.

Barro, R. J., & Lee, J.-W.(1994). Sources of Economic Growth. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 40, 1-46.

Barro, R. and X. Sala-i-Martin (1995).Economic Growth. New York: Mcgraw-Hill.

Barro, Robert J &Sala-i-Martin, Xavier(1999), Economic Growth, First MIT Press Edition

Barro, Robert J &Sala-i-Martin, Xavier(2004), Economic Growth, Second MIT Press Edition

Barth, J.R and M. Bradley (1988). The Impact of Government Spending on Economic Activity, Washington, DC: The National Chamber Foundation, mimeo.

Biswas, Ramendra Nath & Farid, Sheikh (2013), Social Safety Nets in Bangladesh: An Analysis and Future Issues, DMOF Concept Paper No. 05/13, Finance Division, Ministry of Finance, Bangladesh

Bleaney, M., Gemmell, N. and R. Kneller (2001). 'Testing the Endogenous Growth Model: Public Expenditure, Taxation and Growth over the Long-Run', Canadian Journal of Economics, 34, 36-57

Cashin, P. (1995). Government Spending Taxes and Economic Growth. IMF Staff Papers, 42(2), 237-269.

Castles, F. and S. Dowrick (1990). 'The Impact of Government Spending Levels on Medium-Term Economic Growth in the OECD, 1960-85', Journal of TheoreticalPolitics,. 2, 173-204

Corak, Miles (2012), Inequality from Generation to Generation: The United States in Comparision, Graduate School of Public and International Affairs, University of Ottawa, Canada

de la Fuente, A. (1997). Fiscal Policy and Growth in the OECD, CEPR Discussion Paper No. 1755, London: Centre for Economic Policy Research.

Devarajan, S., Swaroop, V., &Zou, H.-fu. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. Journal of Monetary Economics, 37, 313-344.

Dreze, Jean and Sen, Amartya(2013), An Uncertain Glory: India and its Contradictions, published by Allen Lan, Penguin Group, printed at Thomson Press, New Delhi, India ltd.

Farid, Sheikh (2012), Fiscal Policy and Economic Growth: The Case of Bangladesh, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan

Fölster, S.andHenrekson. M (1999). 'Growth and the Public Sector: a Critique of the Critics', European Journal of Political Economy, 15, 337-358.

Fölster S &Henrekson.M (2001).Growth Effect of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries. European Economic Review, 45, 1501-1520.

Household Income and Expenditure Survey (2000, 2005 and 2010), Bangladesh Bureau of Statistics

Kocherlakota, N. and K-M.Yi (1997). 'Is There Endogenous Long-Run Growth? Evidence from the US and UK', Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 29, 2235-2262.

Koester, R.B. and R.C. Kormendi (1989). 'Taxation, Aggregate Activity and Economic Growth: Cross-Country Evidence on Some Supply-Side Hypotheses', Economic Inquiry, 27, 367-386.

Korpi, W. (1985). Economic Growth and the Welfare State: Leaky Bucket or Irrigation System? European Sociological Review, 1(2), 97-118.

Labour Force Survey (2010), Bangladesh Bureau of Statistics

Mankiw, N. G (2009)Principles of Macroeconomics, Fifth edition, South-Western Cengage Learning, 5191 Natorp Boulevard Mason, OH 45040, USA

Mankiw, N. G. (2010). Questions about Fiscal Policy: Implications from the Financial Crisis of 2008-2009. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(3), 177-183.

Mankiw, N. G, Romer, D & Weil, D. N. (1992).A Contribution to the Empirics of Economic Growth.The Quarterly Journal of Economics, 107, 407-38.

Mccallum, J &Blais, A (1987). Government Special Interest Group and Growth. Public Choice, 54, 3-18.

Michael Bleaney,NormanGemmell& Richard Kneller (2001). Testing the Endogenous Growth Model: Public Expenditure, Taxation, and Growth over the Long Run. The Canadian Journal of Economics, 34(1), 36-57.

Miller, S. M. &Russek, F. S. (1997). Fiscal Structures and Economic Growth: International Evidence. Economic Inquiry, 35, 603-613.

Narayan, P. K. (2005). The Government Revenue and Government Expenditure Nexus: Empirical Evidence From Nine Asian Countries. Journal of Asian Economics, 15(6), 1203-1216.

Nazmi, N. and M.D. Ramirez (1997). 'Public and Private Investment and Economic Growth in Mexico', Contemporary Economic Policy, 15, 65-75.

Poverty Manual, 2005 World Bank

Ram, R. (1986). Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross- Section and Time-Series Data. The American Economic Review, 76(1), 191-203.

Ramsey, F. P. (1927). A Contribution to the Theory Of Taxation. The Economic Journal, 37(145), 47-61.

Ramsey, F. P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. The Economic Journal, 38(152), 543-559.

Ravallion, M., and S. Chen(1997) What Can New Survey Data Tell Us About Recent Changes in Distribution and Poverty? World Bank Economic Review, 357-382

Roemer, M., &Gugerty, M.K.(1997). Does Economic Growth Reduce Poverty? Technical Paper of World Bank

Romer, P. (1986). 'Increasing Returns and Long-Run Growth', Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.

Romer, P. (1987). 'Growth Based on Increasing Returns to Specialisation', American Economic Review, 77, 56-62..

Romer, P. (1989).'Endogenous Technological Change', Journal of Political Economy, 98, S71-102.

Romer, P. (1990). Human Capital and Growth: Theory and Evidence, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 40, 47-57.

Rubinson, Richard (1977). Dependence, Government Revenue and Economic Growth, 1995-1970.Studies in Comparative. International Development 12:3-28

Sen, Amartya(1981), Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press

Solon, Gary (1992), Intergenerational Income Mobility in the United States, American Economic Review, Vol 82, No.3 (June), pages 393-408

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 71, 65-94.

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/১৪-৭৫৯৮কম/এ-৪,০০০ বই, ২০১৪ ।